নিরীক্ষণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২২তম সংখ্যা

- শাহ আলমগীর বিস্মৃত হবেন না
- সাংবাদিক নিরাপত্তার নানা দিক

নিরীক্ষা

২২২তম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

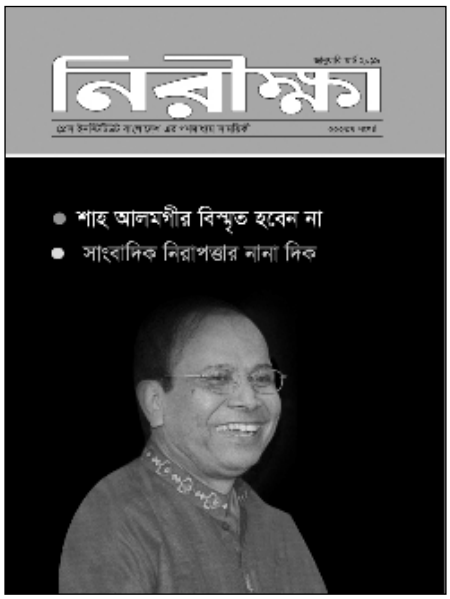

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও পিআইবি মহাপরিচালক শাহ আলমগীর প্রয়াত হয়েছেন। তার প্রয়াণ খুবই বেদনাদায়ক। তিনি ছিলেন কর্মপাগল ও সাংবাদিকবান্ধব। পিআইবি'র দায়িত্ব ছাড়াও একই সঙ্গে তিনি সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এমডি হিসেবেও কাজ করেছেন। আমরা এই গুণী সাংবাদিকের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি। নিরীক্ষার এ সংখ্যায় শাহ আলমগীরকে নিয়ে বিশিষ্টজনদের কয়েকটি লেখা রয়েছে। এছাড়া এ সংখ্যায় রয়েছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বেশ কিছু লেখা। মার্চ স্বাধীনতার মাস। তাই এ সংখ্যায় আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়েও লেখা রয়েছে। আশা করি, পাঠকদের ভালো লাগবে। পাঠকদের ভালো লাগলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে বিশ্বাস।

সম্পাদক
মীর মো. নজরুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
আকতার হোসেন

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

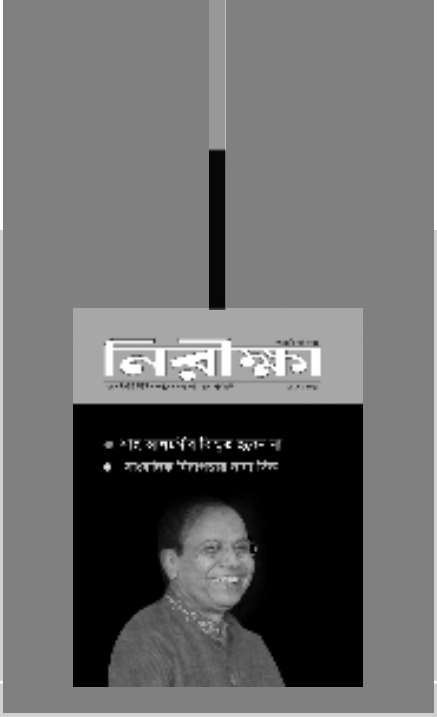

অকৃত্রিম বন্ধু শাহ আলমগীর ৫
কামাল লোহানী

শাহ আলমগীর বিস্মৃত হবেন না ৭
মনজুরুল আহসান বুলবুল

শাহ আলমগীরের জন্য ভালোবাসা ৯
সোহরাব হাসান

ছায়াদানকারী বৃক্ষের মতোই ছিলেন শাহ আলমগীর ১১
আলম রায়হান

মো. শাহ আলমগীর পেশাদারিত্বে সাফল্যের এক স্বতন্ত্র মানুষ ১৩
শামীমা চৌধুরী

সাংবাদিক নির্যাতন ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ১৬
মো. শাহ আলমগীর

সাংবাদিকের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক ভাবনা ২০
কুদরত-ই-মওলা

সাংবাদিক নিরাপত্তার নানা দিক ২২
শিবলী নোমান

সাংবাদিকের ডিজিটাল নিরাপত্তা ২৫
আমীন আল রশীদ

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সময়ের দাবি ২৮
মামুন অর রশিদ

গণমাধ্যমে সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ৩২
ইব্রাহিম নোমান

জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই গণমাধ্যমকর্মী সমাজে অবদান রাখে ৩৫
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

৩৯ সাংবাদিকের পেশাগত সুরক্ষা
মো. কবির হোসেন কাব্য

৪১ গণমাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্য ও নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
রীতা ভৌমিক

৪৪ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও এর প্রভাব
নূর ইসলাম হাবিব

৪৬ প্রবীণের অধিকার, টেকসই উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের ভূমিকা
ডা. মহসিন কবির

৪৯ সংঘাত সংবেদনশীল সাংবাদিকতা: প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা
রাহাত মিনহাজ

৫২ কালরাত্রির কালো উপাখ্যান
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

৫৪ গণহত্যা ১৯৭১: অন্য আলোয় দেখা
মুনতাসীর মামুন

৫৬ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্যই ছিল
এ কে এম শাহনাওয়াজ

৫৮ জননী রমা চৌধুরী
বিনয় দত্ত

৬১ গণমাধ্যম সংবাদ

৬৭ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২২তম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

সূচিপত্র

পেশাদারিত্বের ব্যাপারে আপসহীন শাহ আলমগীর আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন অন্যতম নির্ভরশীল ব্যক্তি। তিনি যে সাংবাদিকদের অধিকারের ব্যাপারে কতটা সোচ্চার ছিলেন, এর প্রমাণ পাই আমরা সাংবাদিকদের চাকরিবিধি প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে। তিনি তাঁর কর্মজগতের গুরু ও দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকেও এ ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা আমরা কখনোই বিস্মৃত হতে পারব না। দুস্থ সাংবাদিকদের কল্যাণে গঠিত ট্রাস্টের ক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত অবদান রেখেছেন। কাজ করেছেন সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, একাগ্রতার প্রতি পূর্ণ অনুগত থেকে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৮

দুর্নীতি কমিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠী তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং গণমাধ্যমকে ল্যাপডগ হিসেবে লালনপালনের জন্য প্রায়ই সাংবাদিক নির্যাতন করছে। ফলে প্রতিবছর স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষায় সাংবাদিক তাদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রদের সহযোগিতায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চয়নের পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতাও নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

দেখুন- পৃষ্ঠা ১৯

সারা বিশ্বে সাংবাদিক নির্যাতন একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা। এ থেকে মুক্ত হওয়া সাংবাদিকতা পেশার জন্য বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ। সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও একটি লক্ষণীয় ইতিবাচক দিক হলো, প্রভাবশালী কায়েমি গোষ্ঠীর ভয়ে আজ পর্যন্ত একজন সাংবাদিকও পেশা ছেড়ে অন্যত্র যাননি। বরং তাঁদের পেশাগত দায়িত্ববোধ আরও বেশি শানিত হয়েছে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৩১

বাংলাদেশ খুবই ছোট, জনঘনত্ব খুব বেশি। সে কারণে এখানে গণহত্যায় একটি সুবিধা পায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা, রাজাকাররা। অর্থাৎ এখানে গণহত্যা ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে হয়নি। ... বাংলাদেশের গণহত্যার বৈশিষ্ট্য হলো, এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ কোথাও আর হত্যা করা হয়নি

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫৫

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিরীক্ষা'র
আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু

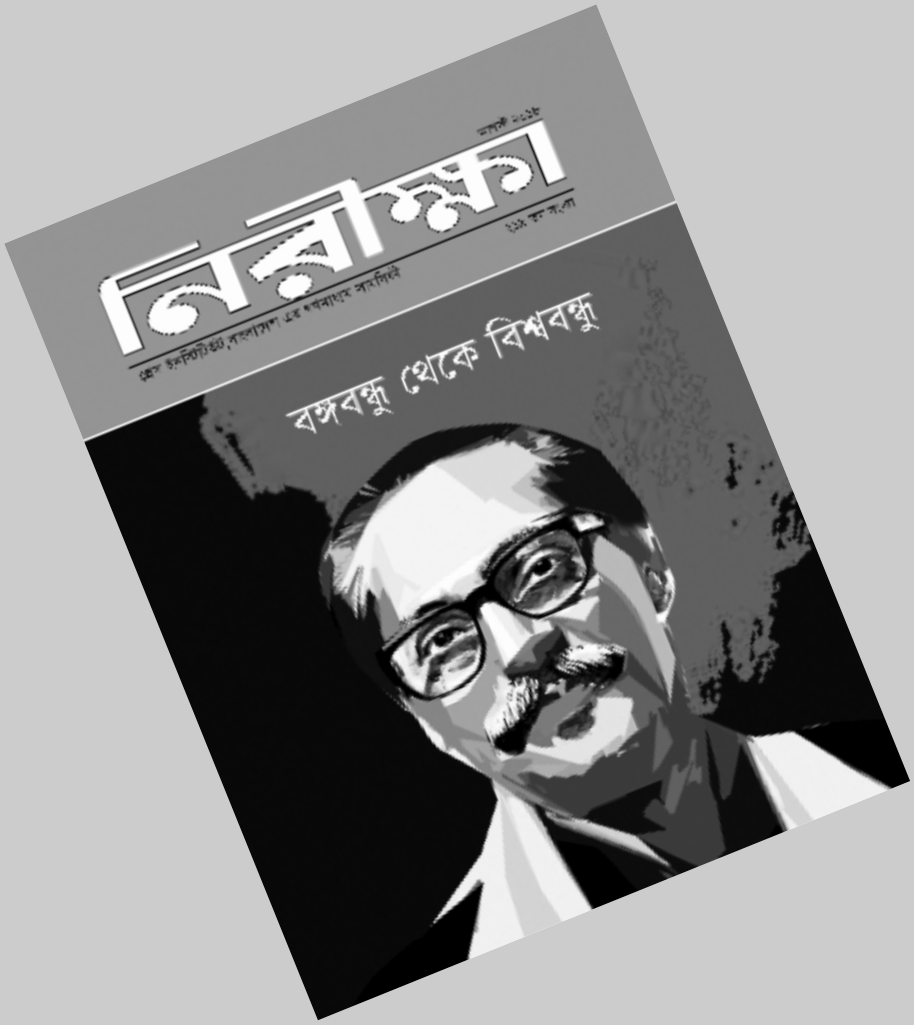

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

অকৃত্রিম বন্ধু শাহ আলমগীর

কামাল লোহানী

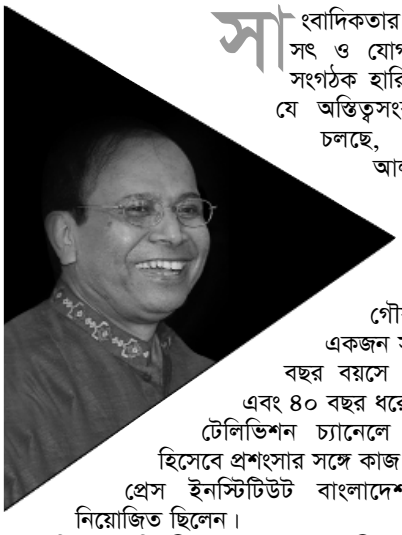

সাংবাদিকতার বিশাল জগৎ থেকে ক্রমশ সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি এবং সৃজনশীল সংগঠক হারিয়ে যাচ্ছেন। সাংবাদিকতা যে অস্তিত্বসংকট ও বিপন্নতার মধ্যে চলছে, তার মধ্যেই শাহ আলমগীরের মতো যোগ্য সংগঠক মাত্র ৬২ বছর বয়সে চলে গেলেন। এটি দুঃখের খবর যেমন, তেমনই গৌরবেরও। তাঁর মতো একজন সুনিপুণ সাংবাদিক মাত্র ২২ বছর বয়সে সাংবাদিকতায় এসেছিলেন এবং ৪০ বছর ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নানা টেলিভিশন চ্যানেলে সংবাদ বিভাগীয় প্রধান হিসেবে প্রশংসার সঙ্গে কাজ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ'র মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন।

বিনম্র, পরিশ্রমী মো. শাহ আলমগীর থেলাসেমিয়া এবং মধুমেহ রোগে ভুগছিলেন। রোগের তোয়াক্কা না করে আলমগীর সাংবাদিকতা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নিরন্তর কাজ করে যেতেন। অকস্মাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারিতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়; কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অগণিত সাংবাদিক সহকর্মী, বন্ধু-স্বজন ছেড়ে চলে গেছেন তিনি। বিভিন্ন স্থানে কয়েক দফা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলমগীরের মরদেহ নেওয়া হলে দীর্ঘ চার দশকের প্রিয় বন্ধু সাংবাদিকরা অভিভাবককে হারিয়ে অশ্রুসজল বিদায় জানান।

শাহ আলমগীর ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। সে সময় তাঁকে নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ইউনিয়নের কার্যক্রম চালাতে হয়। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন। পরবর্তীকালে আলমগীর বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন টেলিভিশনে কাজ করেছেন যোগ্যতা ও প্রশংসার সঙ্গে।

শাহ আলমগীর ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। সে সময় তাঁকে নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ইউনিয়নের কার্যক্রম চালাতে হয়। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন

সততা ও পরিশ্রম ছিল তাঁর কাজের প্রধান উপকরণ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ এবং কল্যাণমুখী। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারেও তিনি ছিলেন বিনম্র। রূঢ় বাস্তবকে মেনে নিয়ে তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সংঘবদ্ধভাবে সাংবাদিক সমাজকে নিয়েই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে একজন ন্যায়নিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে যোগদানের পর শাহ আলমগীর সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত সবার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যেই কেবল কাজ করেছেন তা-ই নয়, এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হয়েই কাজ করতেন। সৃজনশীল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যেমন নিজে দক্ষ ছিলেন, তেমনি প্রেস ইনস্টিটিউটে এসেও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দারুণভাবে যত্নবান হয়েছিলেন। তাই তিনি প্রেস ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাংবাদিকদের সুস্থ সাংবাদিকতার নির্দেশনাই দিয়েছেন। ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমে– গবেষণা ও প্রশিক্ষণে এমনকি প্রকাশনাতেও তাঁর প্রতিভাদীপ্ত স্বাক্ষর আমাদের চোখে পড়ে।

শাহ আলমগীর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন এবং প্রবীণকে নবীনদের মুখোমুখি করে জানবার আগ্রহকে মিটিয়ে নেওয়ার এক সৃজনশীল ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি জীবিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ তোয়াব খান, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ও আমার সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে 'অগ্রজের সঙ্গে একদিন' শিরোনামে প্রত্যেকের স্মৃতিচারণকে গ্রন্থাকারে বের করেছেন। আবার শাহ আলমগীর টেলিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এই সাক্ষাৎকারগুলো প্রচারের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদবিরোধী দক্ষিণ এশীয় সাংস্কৃতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকায় ২০১৬ সালে। এ সময়ে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা ছাড়াও চীন ও জাপানকে এই কনভেনশনে আমন্ত্রণ জানায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেশ কয়েকটি দল কনভেনশনে অংশগ্রহণ করে। অতিথিদের আবাসন সংকুলানের প্রয়োজনে পিআইবি অতিথিশালা ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে যে অমূল্য সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন, তা ভুলার নয়। এছাড়া সাংবাদিক সমাজের মধ্যে কারও ব্যক্তিপর্যায়ের প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি কার্পণ্য করতেন না।

প্রাসঙ্গিক যে কল্যাণ তহবিলটি গঠন করা হয়েছিল, তিনি তার সমন্বয়ক ছিলেন। এমনও শুনেছি, অসুস্থ বা দুর্গত কোনো পরিবারের সাহায্যে তিনি নিজে থেকেই এ অর্থ জোগানের ব্যবস্থা করতেন। এমন এক মহৎপ্রাণ সাংবাদিকের মৃত্যু কেবল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই ক্ষতি করবে না, দেশের উন্নতি এবং মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রেও এ মৃত্যু কঠিন যন্ত্রণাদায়ক হবে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা।

সূত্র: দৈনিক পূর্বকোণ, ১৬ মার্চ ২০১৯

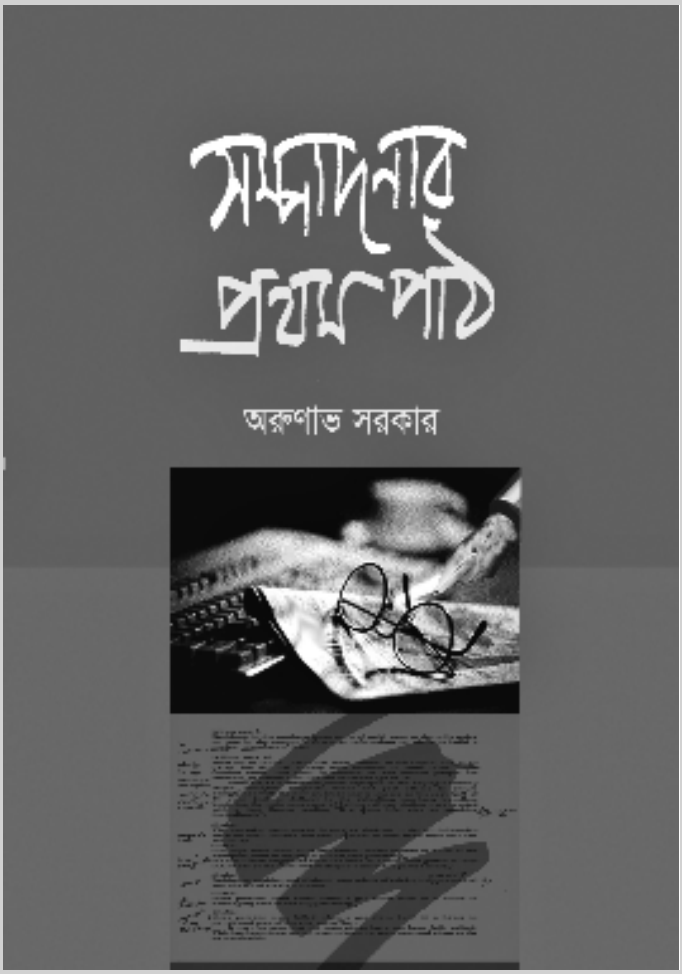

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

শাহ আলমগীর বিস্মৃত হবেন না

মনজুরুল আহসান বুলবুল

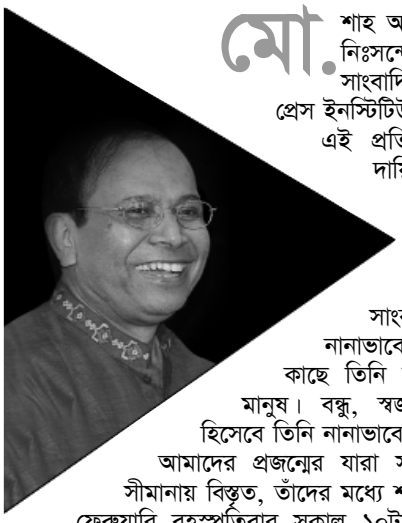

মো. শাহ আলমগীর আমাদের সময়ের নিঃসন্দেহে একজন আলোকিত সাংবাদিক। তাঁর শেষ কর্মস্থল ছিল প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। এই প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর চিরবিদায় আমাদের জন্য বহুমাত্রিক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। পেশাদার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কথা নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। আমার কাছে তিনি ছিলেন অন্যরকম একজন মানুষ। বন্ধু, স্বজন, দায়িত্ববান সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি নানাভাবে আলোচনায় উঠে আসেন। আমাদের প্রজন্মের যারা সৃজনশীল হিসেবে খ্যাতির সীমানায় বিস্তৃত, তাঁদের মধ্যে শাহ আলমগীর অনন্য। ২৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি যখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা তাঁর কর্মময় জীবনের একটি প্রশংসনীয় অধ্যায়। নির্ভরশীল সহযোদ্ধা, সহকর্মী, নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক শাহ আলমগীর আজ নেই; কিন্তু আমার মানসপটে ভেসে উঠছে তাকে ঘিরে কত কিছু! তিনি সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হন ছাত্রজীবন থেকেই। উপমহাদেশের প্রথম শিশু-কিশোর সাপ্তাহিক 'কিশোর বাংলা' পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে সাংবাদিকতায় তাঁর হাতেখড়ি। তারপর তিনি দৈনিক জনতা, বাংলার বাণী, আজাদ, সংবাদ ও প্রথম আলোতে কাজ করেন। ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে তিনি দ্যুতি ছড়াতে থাকেন। তিনি যখন আজাদে কাজ করতেন, তখন আমি সংবাদে। একপর্যায়ে সংবাদ যখন ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন আমি তাকে নিয়ে আসি সংবাদে। সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেন এখানে। আমাদের আরেক বন্ধু (তিনি এখন প্রবাসে) সাইফুল আমিনকেও নিয়ে আসি। যখন প্রথম আলো প্রকাশিত হতে যাচ্ছিল, তখন কথা ছিল দুজনই যাব সেখানে। কিন্তু আমার যাওয়া হলো না; থেকে গেলাম সংবাদে। শাহ আলমগীর গুরুদায়িত্ব নিয়ে যোগ দিলেন প্রথম আলোতে। আমি পরবর্তীকালে দৈনিক যুগান্তরে গেলাম।

২৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি ঢাকা ... তিনি যখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা তাঁর কর্মময় জীবনের একটি প্রশংসনীয় অধ্যায়

সেখান থেকে চলে এলাম ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। একুশে টেলিভিশনে যোগ দিলাম। প্রথম আলো থেকে শাহ আলমগীরও চলে এলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। চ্যানেল আই তখন একজন যোগ্য-দক্ষ বার্তা সম্পাদক খুঁজছিল। শাহ আলমগীর সেখানে যুক্ত হলেন প্রধান বার্তা সম্পাদক হিসেবে। চ্যানেল আইকে নতুনরূপে উদ্ভাসিত করলেন শাহ আলমগীর। এরপর যোগ দিলেন একুশে টেলিভিশনে বার্তা বিভাগের শীর্ষজন হিসেবে। সেখানেও আমার ভূমিকা ছিল। বলা যায়, হৃদয় ও পেশাদারিত্বের এ এক অটুট মেলবন্ধন। যমুনা ও মাছরাঙা টেলিভিশনেও বার্তা বিভাগে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পিআইবিতে যোগদানের আগে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু যে সাংবাদিকতা পেশায়ই তিনি গণ্ডিবদ্ধ ছিলেন, তা নয়। তিনি শিশুকল্যাণ পরিষদ এবং শিশু-কিশোরদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'চাঁদের হাট'-এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

তিনি পিআইবির মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করে মননশীলতা-সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন। পিআইবির নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তিনি অনেকের সঙ্গেই কথা বলতেন। এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আরও নিবিড়। এজন্য আমি গর্ববোধ করি। পরামর্শ চাইতেন, নিতেন। তিনি অনেকের মতো উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না। নিম্নকণ্ঠী এই মানুষটি তাঁর অসাধারণ সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে যেসব কাজ করে গেছেন, সেগুলো দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে। পেশাদারিত্বের ব্যাপারে আপসহীন শাহ আলমগীর আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন অন্যতম নির্ভরশীল ব্যক্তি। তিনি যে সাংবাদিকদের অধিকারের ব্যাপারে কতটা সোচ্চার ছিলেন, এর প্রমাণ পাই আমরা সাংবাদিকদের চাকরিবিধি প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে। তিনি তাঁর কর্মজগতের গুরু ও দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকেও এ ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা আমরা কখনোই বিস্মৃত হতে পারব না। দুস্থ সাংবাদিকদের কল্যাণে গঠিত ট্রাস্টের ক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত অবদান রেখেছেন। কাজ করেছেন সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, একাগ্রতার প্রতি পূর্ণ অনুগত থেকে। একাধারে পেশাদার, নিষ্ঠাবান, সৃজনশীল সাংবাদিক, দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে পরিচিত-বিবেচিত এ মানুষটি সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন এবং সেই অধ্যায়গুলো এ মুহূর্তে আমার সামনে ভেসে উঠছে। তাঁর কোনটা রেখে কোনটা বলি! আমি সত্যিকার অর্থে আমার একজন পরম বন্ধু, স্বজনকে হারালাম। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া– এই উভয়ক্ষেত্রেই আমরা কাজ করেছি খুব ঘনিষ্ঠভাবে এবং এই কাজের অধ্যায়ের বাইরেও তাকে যেভাবে দেখেছি, নির্ণয় করার সুযোগ পেয়েছি, তাঁর জন্যই তিনি আমার কাছে একজন অন্যরকম বড়ো মাপের মানুষ হিসেবে বিবেচিত। শাহ আলমগীর অনেক কিছু ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রতিভা, দক্ষতা ও যোগ্যতার কারণে। সাংবাদিকতায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন অনেক পুরস্কার। শাহ আলমগীরকে পেশাগত জীবনে বিভিন্নভাবে দেখেছি, জেনেছি ও চিনেছি। তাঁর মতো নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু, স্বজন, সহযোদ্ধা খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি অভিজ্ঞতায় কতটা ঋদ্ধ ছিলেন, এর প্রমাণ দিয়েছেন কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁর স্মৃতির প্রতি স্মরণাঞ্জলি কতভাবেই না অর্পণ করা যায়! সৃজনশীল মানুষ লোকান্তরিত হলেও কখনোই মানুষের হৃদয় থেকে বিস্মৃত হন না।

লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন

সূত্র: ১ মার্চ ২০১৯, সমকাল

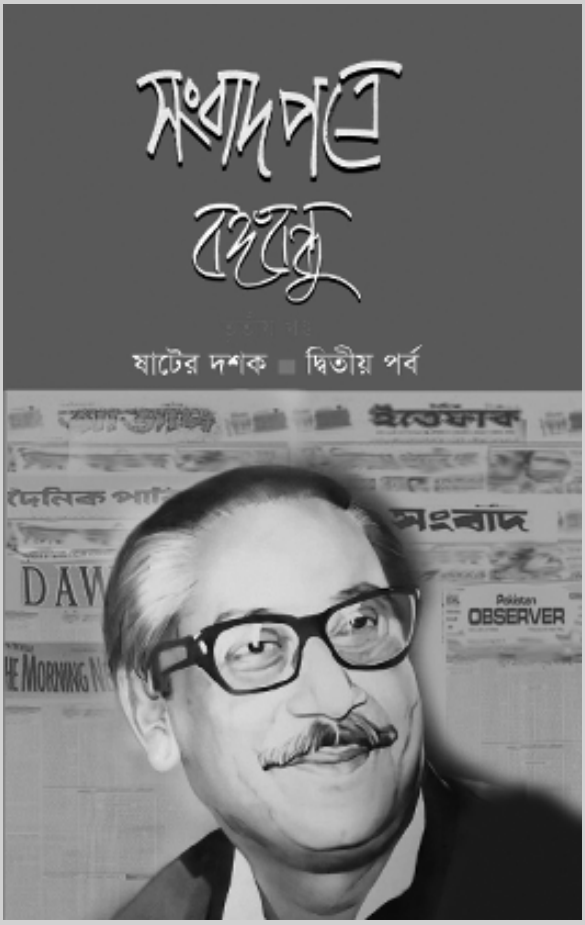

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

শাহ আলমগীরের জন্য ভালোবাসা

সোহরাব হাসান

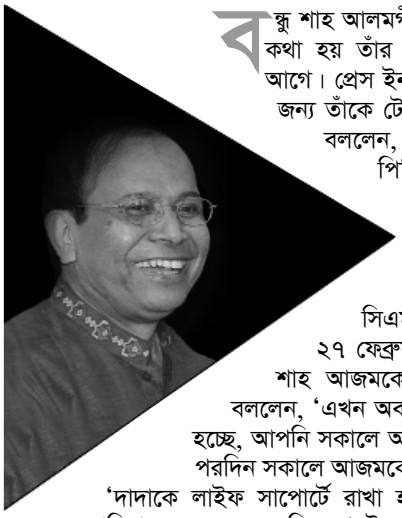

বন্ধু শাহ আলমগীরের সঙ্গে আমার সর্বশেষ কথা হয় তাঁর সিএমএইচে ভর্তি হওয়ার আগে। প্রেস ইনস্টিটিউটের একটি বইয়ের জন্য তাঁকে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি বললেন, তাঁর শরীরটা একটু খারাপ, পিজিতে যাচ্ছেন কোনো রিপোর্ট নিয়ে। ইনস্টিটিউটে গেলে বইটি পাওয়া যাবে। এরপরই শুনলাম তাঁকে সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তাঁর ছোট ভাই শাহ আজমকে টেলিফোন করলে তিনি বললেন, 'এখন অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি সকালে আসুন।'

পরদিন সকালে আজমকে টেলিফোন করলে জানান, 'দাদাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে।' যখন গাড়ি নিয়ে সেনানিবাসের ভেতরে ঢুকছি, তখনই আজমের দ্বিতীয় ফোন। কথা বলতে পারছিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছিলেন। বুঝলাম শাহ আলমগীর আর নেই। সিএমএইচে গিয়ে দেখি তাঁর স্বজন, সুহৃদ ও সহকর্মী সবাই অপেক্ষা করছেন। কখন তাঁর মরদেহ আইসিইউ থেকে বাইরে নিয়ে আসা হবে। এ অপেক্ষা ভীষণ কষ্টের। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল।

এ সময়ে কী সান্ত্বনা দেব তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে? ফেরদৌসী বেগম মায়া– শাহ আলমগীরের স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনাদের বন্ধু তো নেই।' তাঁর এই একটি বাক্যের মধ্যে কী শূন্যতা ও হাহাকার ছিল। মায়া-আলমগীর শুধু আদর্শ দম্পতি ছিলেন না, ছিলেন পরস্পরের একান্ত সহায়, বন্ধু।

কোনো মানুষই চিরদিন বাঁচে না। তাই বলে এত তাড়াতাড়ি আমাদের বন্ধু, সহযোদ্ধা শাহ আলমগীর চলে যাবেন, ভাবিনি। মাস কয়েক আগে আমরা হারালাম আরেক বন্ধু প্রণব সাহাকে। বাংলার বাণী বন্ধ হয়ে গেলে আলমগীরই প্রণবকে চ্যানেল আইয়ে নিয়ে যান। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রণব সেখানেই ছিলেন। আমাদের বন্ধু বিচ্ছেদের পালা শুরু হলো। জানতাম, বেশ কিছুদিন ধরে আলমগীরের শরীর ভালো যাচ্ছিল

> *সাংবাদিকরা সাধারণত দক্ষ প্রশাসক হন না। কিন্তু আলমগীর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে তাঁর ছয় বছরের দায়িত্ব পালনকালে অসামান্য দক্ষতর পরিচয় দিয়েছেন। ... তাঁর (শাহ আলমগীর) সময়টাই ছিল প্রেস ইনস্টিটিউটের সুবর্ণ সময়*

না। তারপরও ডিসেম্বরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। কেবল তা-ই নয়, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে অসুস্থ শরীরে সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের অভিষেকে হাজির হয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সাংবাদিকদের এ সংগঠনটি যথার্থই তাঁকে ন্যায়পাল নির্বাচিত করেছিল। যিনি সবাইকে আপন করতে পারেন, যিনি সহকর্মীদের বিপদে সহায়তার হাত বাড়াতে পারেন, তিনিই তো ন্যায়পাল হওয়ার যোগ্য।

২

শেষদিকে অসুস্থ শরীর নিয়েও শাহ আলমগীর নিয়মিত অফিসে যেতেন। কয়েক দিন আগে সিঙ্গাপুরে তিনি চিকিৎসা করিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলাম, আলমগীর সুস্থ হয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। তিনি চলে গেছেন– কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। তিনি সহযোদ্ধাদের মাঝে থাকবেন তাঁর কর্মে, ভালোবাসায়। দীপ বলেন, প্রেস ক্লাব ছিল বাবার দ্বিতীয় বাড়ি। তাহলে তাঁর প্রথম বাড়ি কোনটি? প্রথম বাড়ি তিনি ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন উত্তরায় স্ত্রী মায়া, ছেলে দীপ, পুত্রবধূ ও মেয়ে অর্চির সঙ্গে, প্রেস ইনস্টিটিউটের সহকর্মীদের সঙ্গে, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সুহৃদ সাংবাদিকদের সঙ্গে। গোড়ানের যেই বাড়িতে শাহ আলমগীর বড়ো হয়েছেন, ছোট ভাইবোনদের গড়ে তুলেছেন, সেই বাড়ি কিংবা প্রতিবেশীদেরইবা বাদ দিই কী করে? আসলে তিনি যেখানে কাজ করেছেন, যাদের সঙ্গে মিশেছেন, প্রত্যেকের বাড়িকে নিজের বাড়ি করতে পেরেছিলেন। তাঁর শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়।

শাহ আলমগীর তাঁর কর্মস্থল প্রেস ইনস্টিটিউট, সাংবাদিক ইউনিয়ন ও জাতীয় প্রেস ক্লাবকেও নিজের পরিবার ভাবতেন। প্রায় চার দশকের সাংবাদিক জীবন তাঁর। কিশোর বাংলা থেকে শুরু করে জনতা, বাংলার বাণী, আজাদ, সংবাদ হয়ে প্রথম আলো। এরপর তিনি চলে গেলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়, দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন চ্যানেল আই, একুশে টিভি, মাছরাঙা ও যমুনা টেলিভিশনে। এসব সংবাদমাধ্যমে যাঁরা তাঁর সহকর্মী ছিলেন, যাঁরা তাঁর সাহচর্যে এসেছেন, তিনি সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন।

বিশেষ করে অনুজ সহকর্মীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় সবসময় সোচ্চার ছিলেন আলমগীর। একবার একটি টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের অন্যায্য খবরদারির প্রতিবাদে চাকরি থেকে ইস্তফাও দিয়েছিলেন। যেদিন শাহ আলমগীর মারা যান, সেদিন আবহাওয়া বৈরী ছিল। তারপরও শোকার্ত মানুষের ঢল নেমেছিল প্রেস ক্লাবে। তাঁর এক তরুণ সহকর্মী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আলমগীর ভাই ছিলেন আমাদের মাথার ওপর ছায়ার মতো। আজ সেই ছায়াটি সরে গেল।'

যমুনা টেলিভিশন ছাড়ার পর শাহ আলমগীর ফের সংবাদপত্রে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। দু-একটা জায়গায় কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পান। ২০১৩ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর নানা সীমাবদ্ধতা আছে, আছে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এসব মেনে নিয়েও তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে সাংবাদিকবান্ধব করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সময়ে প্রেস ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ– দুটিরই প্রসার ঘটেছে। শাহ আলমগীর সেখানে অনলাইন সাংবাদিকতা কোর্স চালু করেন। আগে থেকেই প্রেস ইনস্টিটিউটে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল। তাঁর সময়ই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবিতে শহীদ সাংবাদিক কর্নার প্রতিষ্ঠা ও সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল গঠনেও ছিল তাঁর উদ্যোগী ভূমিকা।

সাংবাদিকরা সাধারণত দক্ষ প্রশাসক হন না। কিন্তু আলমগীর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে তাঁর ছয় বছরের দায়িত্ব পালনকালে অসামান্য দক্ষতর পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই সরকারের একজন সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব বললেন, তাঁর (শাহ আলমগীর) সময়টাই ছিল প্রেস ইনস্টিটিউটের সুবর্ণ সময়। সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল গঠিত হলে এর অনারারি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বও দেওয়া হয় তাঁকে। প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্বের বাইরে এটি ছিল অতিরিক্ত দায়িত্ব। তিনি দুস্থ সাংবাদিকদের তালিকা করে অর্থ পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কারও কারও চেক বাড়িতে বা অফিসে পৌঁছে দিয়েছেন। এটি কোনোভাবে পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।

৩

গেল শতকের সত্তর ও আশির দশকটি ছিল আমাদের স্বপ্ন দেখার ও স্বপ্ন দেখানোর সময়। একই সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গেরও। ছাত্রসংগঠন, শিশুসংগঠন কিংবা সাংবাদিকতা– যেখানেই আমরা কাজ করেছি, একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। সমাজবাদী আদর্শের মধ্য দিয়ে গণমানুষের মুক্তি খুঁজেছি। সামরিক শাসনের কঠিন সময়ে সাংবাদিকতা পেশা ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যে বন্ধুবৃত্তটি গড়ে ওঠে, তার অন্যতম ভরকেন্দ্র ছিলেন শাহ আলমগীর। সেই বৃত্তে আরও যুক্ত হয়েছিলেন সাংবাদিক সুধীর কৈবর্ত দাস, প্রণব সাহা, সৈয়দ আজিজুল হক, সুশান্ত মজুমদার, সাইদুল হক, সাইফুল আমিন, দুলাল মাহমুদ, আহমেদ ফারুক হাসান, নান্টু রায় প্রমুখ। আবার পেশাগতভাবে আমাদের বন্ধুবলয়ে আরও যুক্ত হয়েছিলেন শান্তিময় বিশ্বাস, সিতাংশু গুহ, প্রদীপ খাস্তগীর, অসীম কুমার উকিল, দাউদ ভূঁইয়া, শরীফ শাহবুদ্দিন, এ কে জোয়ারদার, নাহিদ আখতার, বিনা পাল, স্বপন সরকার, ঝর্না বেগম, আফরোজা নাজনীন, বিমল দত্ত, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ। সাংবাদিক গুরু হিসেবে পেয়েছিলাম সন্তোষ গুপ্ত, বজলুর রহমান, মীর নুরুল ইসলাম, শহীদুল হক, নাজিমউদ্দিন মানিককে।

আশির দশকের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থা– আইওজের বাংলাদেশ চ্যাপটার গঠনকে কেন্দ্র করেও সাংবাদিকদের নিয়ে আরেকটি ফোরাম গঠিত হয়। সংবাদ সম্পাদক বজলুর রহমান এর কেন্দ্রে থাকলেও দাপ্তরিক ও যোগাযোগের মূল কাজটি করতেন মনজুরুল আহসান বুলবুল ও শাহ আলমগীর। দেশের বাইরের সাংবাদিক জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগও প্রতিষ্ঠিত হয় আইওজের মাধ্যমে। সেই উত্তাল সময়ে আমাদের ইচ্ছে হলো চলচ্চিত্র তৈরি করার। সেখানেও আলমগীরের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। প্রণব সাহা চিত্রনাট্য লিখলেন। প্রতি শুক্রবার আমরা ফকিরাপুলের একটি অফিসে বসতাম। কিন্তু সেই চলচ্চিত্র আলোর মুখ দেখার আগেই উদ্যোগের ইতি ঘটল। কিন্তু বন্ধুত্ব অটুট রইল।

আগেই বলেছি, শাহ আলমগীর ছিলেন আমাদের চার দশকের বন্ধু। আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি, সংগঠন করেছি, সাংবাদিকতা করেছি। সেই সময়ে সাংবাদিকতা ছিল আরও বেশি অনিশ্চিত পেশা। সামরিক শাসক এরশাদের রোষানলে পড়ে একের পর এক পত্রিকা বন্ধ হচ্ছিল আর সাংবাদিকরা বেকার হচ্ছিলেন। কিশোর বাংলা ছিল বাংলাদেশ অবজারভারের সহযোগী পত্রিকা। কিন্তু এরশাদ অবজারভার পাকিস্তান আমলের মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর কাছে ফেরত দেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার কারণে যার নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৪ সালে এরশাদের হঠাৎ খেয়াল হলো একটি পত্রিকা বের করবেন তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করতে। দৈনিক জনতা। আরও অনেকের সঙ্গে শাহ আলমগীরও সেখানে যোগ দিলেন। কিন্তু কয়েক মাস যেতেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। শাহ আলমগীর বেকার হলেন; এলেন বাংলার বাণীতে। ১৯৮৭ সালে এরশাদ বাংলার বাণী বন্ধ করে দিলে আমরা দুজনই বেকার হয়ে যাই এবং আলমগীরের চেষ্টায় আজাদে ঠাঁই হয়।

৪

বাংলার বাণী, আজাদ ও সংবাদে আমরা দীর্ঘদিন সহকর্মী ছিলাম। দুর্ভাগ্য তিনটি পত্রিকায়ই বেতন-ভাতা অনিয়মিত ছিল। তখন দুজনই সদ্য বিয়ে করেছি। পরিবারের বড়ো সন্তান হিসেবে শাহ আলমগীরের বাড়তি দায়িত্ব ছিল। তাই অনিয়মিত বেতনের দৈনিকে চাকরি করার পাশাপাশি আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও খণ্ডকালীন কাজ করতে হয়েছে। শাহ আলমগীর কোনো পত্রিকায় গেলে চেষ্টা করেছেন আমার জন্য জায়গা করে দিতে। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাঁর জন্য। আশির দশকের শেষদিকে এভাবেই আমরা সাপ্তাহিক ঢাকা, সাপ্তাহিক ছুটি, কনক ও এই সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। আমরা রাতের না হলেও দিনের খাবার ভাগ করে খেয়েছি। আসলে 'বেকারির বা আধা বেকারির' দিনগুলোতেই আমাদের বন্ধুত্ব গভীর হয়েছিল। আজ পেছনে তাকালে দেখি, যে রাজনীতি আমাদের একত্র করেছিল, সবার অগোচরে সে রাজনীতি হারিয়ে গেছে। স্বপ্নগুলো ধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের সৌহার্দ ও বন্ধুত্ব হারায়নি। হারাবে না কোনো দিন।

সমসাময়িক, পূর্ব ও উত্তর প্রজন্মের অনেক সাংবাদিকের প্রিয় সহকর্মী ও সুহৃদ ছিলেন শাহ আলমগীর। তিনি যেখানেই গিয়েছেন, পুরোনো বন্ধুদের কথা মনে রেখেছেন; যাঁকে যেভাবে সম্ভব তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সহকর্মী থেকে সহমর্মী হয়েছেন। আমাদের নিত্য বিযুক্ত হওয়া ও বিযুক্ত করা এই সমাজে এটাও কম পাওয়া নয়।

লেখক: সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো

ছায়াদানকারী বৃক্ষের মতোই ছিলেন শাহ আলমগীর

আলম রায়হান

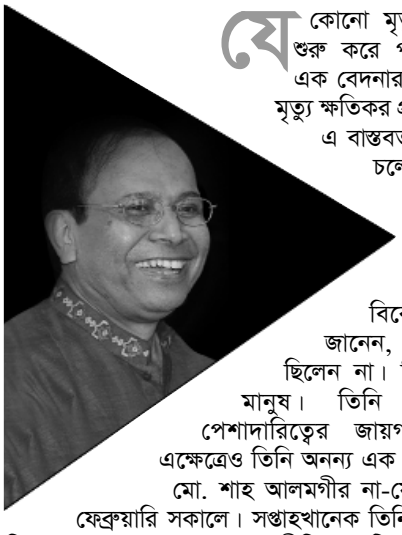

যে কোনো মৃত্যুই পরিবার-স্বজন থেকে শুরু করে পরিচিতজনদের জন্য চরম এক বেদনার বিষয়। আবার যে কোনো মৃত্যু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এ বাস্তবতায় মো. শাহ আলমগীরের চলে যাওয়া তাঁর পরিবার-স্বজন-পরিচিতজন-বন্ধুবান্ধব এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনেকেই জানেন, তিনি কেবল সাংবাদিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বৃক্ষপ্রবণতার মানুষ। তিনি ইউনিয়ন-নেতা হয়েও পেশাদারিত্বের জায়গায় সক্রিয় থেকেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি অনন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মো. শাহ আলমগীর না-ফেরার দেশে চলে যান ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে। সপ্তাহখানেক তিনি সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এর আগে নানা শারীরিক জটিলতায় তিনি দেশে-বিদেশে চিকিৎসা নিয়েছেন প্রায় দুই বছর। তাঁর এই অসুস্থতা তাঁকে কর্মজীবন থেকে দূরে রাখতে পারেনি। কিন্তু এবার তিনি হার মানলেন নিয়তির কাছে। বড়ো অসময়ে তাঁর এই চলে যাওয়ার বিষয়টি খুবই বেদনার। কেবল ঘনিষ্ঠজন নন, তাঁর সাধারণ পরিচিতজনরাও মুষড়ে পড়েছেন শাহ আলমগীরের এই অসময়ে চলে যাওয়ায়। তাঁর চলে যাওয়া এক অপূরণীয় ক্ষতি।

দীর্ঘ ৩৫ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে শাহ আলমগীর একাধিক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সাপ্তাহিক কিশোর বাংলা পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু। এরপর তিনি কাজ করেন দৈনিক জনতা, বাংলার বাণী, আজাদ ও সংবাদে। প্রথম আলো প্রকাশের সময় থেকেই তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুগ্ম বার্তা-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর তিনি টেলিভিশনে যুক্ত হন। চ্যানেল আইয়ের প্রধান বার্তা সম্পাদক, একুশে টেলিভিশনে হেড অব নিউজ, যমুনা টেলিভিশনে পরিচালক (বার্তা) এবং মাছরাঙা টেলিভিশনে বার্তাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব

বৈরী পরিবেশে পড়া সাংবাদিকদের প্রতি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগও ছিল শাহ আলমগীরের। ... তাঁর বিশেষ উদ্যোগে ব্যাংক লোনের বিশাল বোঝা থেকে মুক্ত হয়েছে পিআইবিও

পালন করেন। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন শাহ আলমগীর।

সাংবাদিকতা ছিল মো. শাহ আলমগীরের প্রধান পরিচয়। সাংবাদিকতার মূল পেশার মতোই প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক হিসেবেও দক্ষতা ও সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তিনি। শুনতে অস্বস্তিকর হলেও এটি বাস্তবতা, নানা ক্ষেত্রের মতো সাংবাদিকতা পেশায় আগাছার আধিক্য সীমা ছাড়িয়েছে অনেক আগে। আর শুধু আগাছা নয়, বিষবৃক্ষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এ অরাজক পরিস্থিতির মধ্য থেকেও শাহ আলমগীর বৃক্ষ হিসেবে দৃঢ়তার সঙ্গে নীরবে অবদান রেখেছেন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, ইউনিয়নে এবং ডিজি হিসেবে প্রশাসনে। পেশায় তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক মো. শাহ আলমগীর ২০১৩ সালের ৭ জুলাই পিআইবি'র মহাপরিচালকের গুরুদায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে যাত্রালগ্নে পিআইবি'র প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন আবদুস সালাম। এরপরে তোয়াব খান, এ বি এম মূসাসহ বিশিষ্ট সাংবাদিকরা পিআইবি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমলারাও ছিলেন এ পদে। মো. শাহ আলমগীরের আগে পিআইবি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন ৩২ জন। সরকার ২০১৮ সালের জুলাইয়ে পিআইবি মহাপরিচালক হিসেবে মো. শাহ আলমগীরের মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করে। ফলে নিদেনপক্ষে ২০১৯ সালের ৭ জুলাই পর্যন্ত পিআইবির মহাপরিচালকের দায়িত্বে থাকার কথা ছিল শাহ আলমগীরের। কিন্তু আল্লাহর আদেশে হয়েছে তাঁর অসময়ে চলে যাওয়া। এ ধরনের আদেশ না চাইলেও মানতে বাধ্য নিরুপায় প্রাণিকুল!

শাহ আলমগীর ভাইয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মেয়াদ মাত্র কয়েক মাসের। শুরুতেই আনন্দিত হয়েছিলাম, একজন নিখাদ ভালো মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ সম্পর্ক না হলেই আমার জন্য ভালো হতো। কারণ পরিচিতজনের চেয়ে ঘনিষ্ঠজনদের চলে যাওয়ার কষ্টের তীব্রতা অনেক বেশি! তিনি সাংবাদিকদের পেশাগত বৈরী পরিস্থিতির বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। আসলে এটি ছিল তাঁর ইনবিল্ট প্রবণতা। বিষয়টি নিয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে কথাও হয়েছে। তিনি বলেছেন, সাংবাদিকরা যে বৈরী পরিবেশে টিকে থাকার চেষ্টা করে, তা আমার নিজের জীবনেও তো দেখেছি! এ সময় তাঁর ছাত্রজীবনের বৈরিতার কথাও বলেছেন। একদিন তিনি বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রায় এক বছর তাঁরা দুই বন্ধু রাতের বেলা দোকানে ঘুমিয়েছেন। গভীর রাতে দোকান বন্ধ হওয়ার পর ঘুমাতেন, উঠতেন সকালে দোকান খোলার সময় বিবেচনায় রেখে। হয়তো ছাত্রজীবনে নিজের এই বৈরী অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখেই তাঁর কাছে কোনো ছাত্র গেলে সাধারণ সাধ্যের বাইরেও সহায়তা করতেন। এ বিষয়টি শুনছি এবং নিজেও দেখেছি। আর পিআইবি'র এখতিয়ারে সাংবাদিকদের জন্য কতটা করেছেন, তা কারোই অজানা নয়, হয়তো সবারই জানা।

বৈরী পরিবেশে পড়া সাংবাদিকদের প্রতি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগও ছিল শাহ আলমগীরের। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক মৃত সাংবাদিকের পরিবারের ব্যাংক লোনের বোঝা বিরাট অঙ্ক হ্রাস পেয়েছে। তাঁর বিশেষ উদ্যোগে ব্যাংক লোনের বিশাল বোঝা থেকে মুক্ত হয়েছে পিআইবিও। মানবিকতা ও দক্ষতাসহ নানা মাপকাঠিতে শাহ আলমগীরের মতো খুব বেশি মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

পেশাগত জীবনে শাহ আলমগীর পৌঁছেছিলেন সর্বোচ্চ অবস্থানে। সাংবাদিকদের নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাঁর এ অধিষ্ঠান হয়েছে ধাপে ধাপে, ধীরলয়ে। তাড়াহুড়া বা হাহুতাশ করতে তাকে কেউ দেখেনি। এদিকে আকাশছোঁয়ার অবস্থানে পৌঁছেও তিনি বদলে যাননি। অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন, বন্ধুদের সমাদর করেছেন, অনুজদের করেছেন স্নেহ। আর অনুজরাই যেন ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মমতা ও সহায়তার ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন অনুজদের। তিনি আসলে অন্যের আশ্রয়ের সুবিধার জন্য নিজেকে প্রসারিত করে রাখতেন; উদার বৃক্ষ যেমন প্রসারিত করে ডালপালা। অন্যকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে কখনো আবার বৃক্ষের ক্ষতিও হয়। মূল কাঠামোতে কোঠর বানিয়ে বাসা বাঁধে পাখি; ডালপালা ভাঙে বাঁদর-উল্লুকেরা। তবু বৃক্ষ কিছু বলে না! তেমনই আলমগীর ভাইকে কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে শুনেনি কখনো কেউ।

সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রেখেছেন তিনি। সাংবাদিকরা ছিলেন তাঁর কাছে বিশেষ মমতার। আর তাঁর মমতার পক্ষপাতিত্ব ছিল দুস্থ সাংবাদিকদের প্রতি।

পিআইবি'র ধারণার জন্ম ১৯৭৪ সালে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকারের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ১৯৭৪ সালের ২৪ মে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। তখন ভাবা হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে ন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৬ সালের ১৮ আগস্ট একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে পিআইবি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পিআইবি'র কাজ মূলত সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম ও উন্নয়ন যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা নিয়ে। পিআইবি'র প্রধান কাজগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (ক) কর্মরত সাংবাদিক এবং সরকার অথবা যে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত সংবাদ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করা, (খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাংবাদিকতা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ সম্পর্কিত উপাত্ত ও তথ্য প্রকাশ করা, (গ) যে কোনো সংবাদপত্র বা বার্তা সংস্থায় উপদেশক ও পরামর্শক সেবা প্রদান করা, (ঘ) সংবাদপত্র সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সরকার মতামত চাইলে সে বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, (চ) বাংলাদেশে সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং (ছ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (এক শিক্ষাবর্ষ মেয়াদি) পরিচালনা করা।

বর্ণিত এ কর্মধারার বাইরেও দেশের সাংবাদিকতা নিয়ে অনেক কাজ করেছেন শাহ আলমগীর। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– 'অগ্রজের সঙ্গে একদিন' শিরোনামে আইকন সাংবাদিকের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এ

পেশাগত জীবনে শাহ আলমগীর পৌঁছেছিলেন সর্বোচ্চ অবস্থানে। সাংবাদিকদের নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাঁর এ অধিষ্ঠান হয়েছে ধাপে ধাপে, ধীরলয়ে। তাড়াহুড়া বা হাহুতাশ করতে তাকে কেউ দেখেনি। এদিকে আকাশছোঁয়ার অবস্থানে পৌঁছেও তিনি বদলে যাননি

স্মৃতিচারণ বই আকারেও প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরনের তিনটি বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো পড়ে সাংবাদিকতার নানা দিক অধিকতর গভীরভাবে জানা যাবে। তিনটিই আমি পড়েছি। এর একটি পড়ে জেনেছি, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সাংবাদিক ও লেখক হয়ে ওঠার সূচনা হয়েছিল বরিশাল থেকে প্রকাশিত দুটি পত্রিকার মাধ্যমে, ১৯৪৬ সালে। তখন তাঁর বয়স ১২ বছর। তখন বরিশাল থেকে 'বরিশালহিতৈষী' ও 'নকিব' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ হতো; একটি দৈনিক এবং অপরটি সাপ্তাহিক। এখন বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিকের সংখ্যা অর্ধশত ছাড়িয়েছে বলে শুনেছি। অনেক পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ও মান নিয়ে জনমনেও বেশ বিরক্তি রয়েছে। অথচ বরিশাল থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় লিখে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মতো কালজয়ী সাংবাদিক ও লেখক তৈরি হয়েছেন। এমনকি বরিশালের নকিব পত্রিকায় কাজী নজরুলও কবিতা লিখেছেন। বরিশাল থেকে প্রকাশিত পত্রিকার কারণে অনেক সুষ্ঠু সাংবাদিক তৈরি হয়েছেন। যারা এখন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বরিশালের বেশির ভাগ পত্রিকায় কারা লেখেন, কী ছাপা হয়! কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে বরিশাল থেকে প্রকাশিত অনেক পত্রিকার সাংবাদিকতার মান নিয়ে অনেকেরই বেশ উদ্বেগ আছে।

বরিশালসহ সারা দেশের সাংবাদিকতার এ ধরনের উদ্বেগজনক বিষয়গুলোও ছুঁয়েছিল পিআইবি মহাপরিচালক শাহ আলমগীরকে। বরিশাল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসহ সারা দেশের পত্রিকার মানোন্নয়নে বিশেষ কিছু করার সক্রিয় ধারায় ছিলেন তিনি। এ নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলাপও করেছেন। তিনি একটি কর্মধারার ছকও প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম! এখন কে বা কারা ভাববেন আলমগীর ভাইয়ের মতো? অভিজ্ঞতার আলোকে বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে, মহান আল্লাহপাকই জানেন!

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

মো. শাহ আলমগীর
পেশাদারিত্বে সাফল্যের এক স্বতন্ত্র মানুষ

শামীমা চৌধুরী

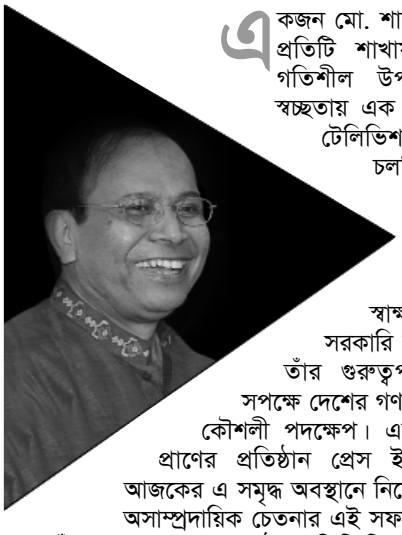

একজন মো. শাহ আলমগীর– গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর উজ্জ্বল ও গতিশীল উপস্থাপনা। পেশাদারিত্বের স্বচ্ছতায় এক স্বতন্ত্র মানুষ। সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল, বেতার, চলচ্চিত্র– প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি রেখে গেছেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, সাংগঠনিক শক্তি আর পেশাদারি সাফল্যের স্বাক্ষর। এর সঙ্গে আরও যুক্ত সরকারি উচ্চ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দেশের গণমাধ্যমকে পরিচালিত করার কৌশলী পদক্ষেপ। এর উদাহরণ সাংবাদিকদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ'কে আজকের এ সমৃদ্ধ অবস্থানে নিয়ে আসা।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার এই সফল মানুষটি সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর জন্ম থেকে বেড়ে ওঠার প্রতিটি দিকে আলোকপাত করতে হয়। জন্ম ১৯৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। বাবা আবু ইউসুফ সরকার, মা জোবেদা খাতুন। পৈতৃক আদি নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার দুরুইল গ্রামে। তবে তাঁর বাবা পরে ঢাকার গোড়ানে স্থায়ী হন। দশ ভাইবোনের সংসারে তিনি ছিলেন সবার বড়ো। বাবার সরকারি চাকরির কারণে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেক জেলায়। এ কারণে বহু ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সুযোগ হয়, যা তাঁর মানস গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষ করে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের স্মৃতি তাঁকে করে তুলেছিল একজন আবেগী মানুষ, যা তাঁকে মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়ে ছিল।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও রাজনীতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। জড়িত হন ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে কলেজ-জীবন থেকে। ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। সেই বছরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সপরিবারে ঘাতকের হাতে শহিদ হন। চারিদিকে উত্তাল পরিস্থিতি। এর মধ্যেই এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। তিনি ছিলেন এর অন্যতম নেতৃত্বে ও অগ্রভাগে। তিনি ছিলেন

জন্ম ১৯৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। বাবা আবু ইউসুফ সরকার, মা জোবেদা খাতুন। পৈতৃক আদি নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার দুরুইল গ্রামে। তবে তাঁর বাবা পরে ঢাকার গোড়ানে স্থায়ী হন

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদক। বাংলায় অনার্সসহ এমএ পাস করেন। ১৯৮৯ সালে মস্কো ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম থেকে তিনি সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা লাভ করেন। এরপর পেশার পাশাপাশি বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর পেশাকে সমৃদ্ধ করে।

সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন ছিল বর্ণাঢ্য আর সাফল্যের মোড়কে মোড়ানো। লেখার অভ্যাস ছিল তাঁর ছোটবেলা থেকেই। সেই সঙ্গে করতেন শিশু সংগঠন। শিশুদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই যেন তাঁর সাংবাদিক হয়ে ওঠা। তিনি ছিলেন শিশু সংগঠন চাঁদের হাটের সভাপতি, শিশু কল্যাণ পরিষদের সভাপতি। ১৯৮০ সালে দেশের প্রথম শিশু-কিশোর পত্রিকা সাপ্তাহিক কিশোর বাংলার মধ্য দিয়ে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। এর মাঝে ১৯৮৪ সালে তিনি দৈনিক জনতায় জুনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৭ সালে যোগ দেন দৈনিক আজাদে সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে। পরে শিফট ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি সংবাদে যোগ দেন সিনিয়র সাব-এডিটর ও শিফট ইনচার্জ হিসেবে। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম বার্তা সম্পাদক ছিলেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও বাংলাদেশ বেতারের মহানগর অনুষ্ঠানে মূল পাণ্ডুলিপি ও শিল্প- সংস্কৃতির ওপর রিপোর্ট লিখতেন। ২০০১ সালে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনে আসে পরিবর্তন। বন্ধু ফরিদুর রেজা সাগর স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আই চালু করেন। এই চ্যানেলের বার্তা বিভাগের দায়িত্ব দেন বন্ধু শাহ আলমগীরকে। এই চ্যানেলে প্রথম প্রধান বার্তা সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর মেধা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে চ্যানেল সংবাদে আনেন নতুনত্ব, যা চ্যানেল আইকে জনপ্রিয় করে তোলে। ২০০৭ সালে হেড অব নিউজ হিসেবে একুশে টিভিতে যোগ দেন। বার্তা পরিচালক হিসেবে ২০০৮ সালে যোগ দেন যমুনা টেলিভিশনে। ২০১০ সালে তিনি হেড অব নিউজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাছরাঙা টেলিভিশনের। ২০১৩ সালে প্রধান সম্পাদক হিসেবে এশিয়ান টেলিভিশনে যোগ দেন। এটিই ছিল চ্যানেলে তাঁর পেশাগত শেষ কাজ। ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তাঁর অবস্থান প্রমাণ করে– তিনি এই মিডিয়ার জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। কারণ এরপর ২০১৩ সালের ৭ জুলাই থেকে আমৃত্যু তিনি পিআইবি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সঙ্গে সরকারের বহু জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন– তিনি বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড কমিটির সদস্য, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এমডি, এসিড সারভাইভার্সের সদস্য, সালমা সোবহান ফেলোশিপের কোঅর্ডিনেটর ইত্যাদি।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি চেষ্টা করেছেন এই পেশার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে। নেমেছেন রাজপথে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে নেমেছিলেন রাজপথে। নেতৃত্ব দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাংবাদিক ইউনিয়নের। তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং পর পর দুবার সভাপতি নির্বাচিত হন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে গেছেন তিনি। বগুড়ার এক ট্রাক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা, আহসান উল্লাহ মাস্টারের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, একাত্তরের ঘাতক-দালালদের চিহ্নিত করা ইত্যাদি ঘটনা বিস্তারিতভাবে প্রচার করায় তাঁর জীবনের ওপর নেমে আসে ক্ষমতাসীনদের খড়্গহস্ত।

একজন সংস্কৃতিবান মানুষ ও সংগঠক হিসেবে তাঁর আবদান উজ্জ্বল। চলচ্চিত্রের প্রতি ছিল তাঁর আজন্ম ভালোবাসা। ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সও করেছিলেন। শিশু চলচ্চিত্র সংসদের আহ্বায়ক ও সভাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগে আশির দশকে প্রথম শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বহু ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে নির্মিত 'অবিচার' ছবির প্রধান সহকারী পরিচালক ছিলেন তিনি। পরিচালনা করেছেন তথ্যচিত্র গোর্কি, ফেনী নদীর বাঁধ, কৃষিতে বান্দরবান।

তিনি সাংবাদিকতার জন্য অর্জন করেছেন অনেক সম্মাননা। এর মধ্যে রয়েছে কবি আবু জাফর ওবায়েদ উল্লা পুরস্কার, চন্দ্রাবতী গোল্ড মেডেল, কুমিল্লা যুব সমিতি পুরস্কার, রোটারি ঢাকা দক্ষিণের দেওয়া সম্মাননা ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে, প্রগতিশীলতার পক্ষে নিরন্তর পথচলা এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন ছিল শান্তিময়। স্ত্রী ফওজিয়া বেগম মায়া একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত। ছেলে আশিকুল আলম দীপ ব্যাংকার (এইচএসবিসি ব্যাংক), পুত্রবধূও ব্যাংকার, একমাত্র কন্যা অর্চি অনন্যা আইইউবিতে সাংবাদিকতায় পড়ছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি এই পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়া গোটা সাংবাদিক সমাজকে ঢেকে দিয়েছে বেদনার চাদরে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে সাংবাদিক **শামীমা চৌধুরী**কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরেন মিডিয়া নিয়ে তাঁর বিভিন্ন ভাবনা। যার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো:

সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল– এ দুটি মাধ্যম আপনাকে সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, খ্যাতি দিয়েছে, এটিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

মো. শাহ আলমগীর: আমি আসলে একজন ভাগ্যবান সাংবাদিক। কারণ এ দুটি মাধ্যমে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এ দেশের সাংবাদিকতার আদি প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র। এ দেশের মানুষের রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদপত্রই ছিল প্রধান শক্তি। সেই সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে সংবাদপত্রই ছিল প্রধান মাধ্যম। এ দেশে সাংবাদিকতা পেশার প্রকাশ ঘটেছে সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে। এখনও সকালে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ না বুলালে আমাদের চলে না। কাজেই আমাদের গণমাধ্যমের প্রধান ক্ষেত্র সংবাদপত্র। আর চ্যানেল সময়ের দাবি। তবে শুরু থেকে চ্যানেলে যারা কাজ করত, তাঁরা সবাই সংবাদপত্র থেকেই এসেছিল।

ভিজুয়াল মাধ্যমের আকর্ষণকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। মানুষের হাতে সময় কম। চ্যানেলের পর্দা দর্শকদের টানে। নিরক্ষর মানুষও এখান থেকে তথ্য নিতে পারে। তাই এটির গুরুত্বও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আমি মনে করি, আমার ভিত্তি যেহেতু সংবাদপত্র, তাই এ মাধ্যমটির প্রতি আমার মমত্ববোধ আলাদা। সংবাদপত্রে ছিলাম বলেই তো যোগ্যতা অর্জন করেছি।

আবার সাংবাদিকতায় ফিরে গেলে কোন মাধ্যমটিকে বেছে নেবেন?

মো. শাহ আলমগীর: অবশ্যই টিভি চ্যানেল। কারণ পিআইবির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার আগে আমি চ্যানেলেই ছিলাম। এর পরিচালনা পদ্ধতি, ব্যবসা পদ্ধতি, প্রচারণা পদ্ধতি, লোকবল নিয়োগ পদ্ধতি আমার জানা। কাজটি আমার জন্য সহজ। তবে পত্রিকাকে ছোটো করে নয়।

দেশে এখন অনেক সংবাদপত্র, চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়া। সেই সঙ্গে হলুদ সাংবাদিকতার ছড়াছড়ি। একজন দায়িত্বশীল মিডিয়া পারসন হিসেবে এ ব্যাপারে করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন?

মো. শাহ আলমগীর: এই অভিযোগের সঙ্গে আমি একমত। এখন শুধু রাজধানী নয়, রাজধানীর বাইরে থেকে অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। দেশে প্রায় ৩৩টি চ্যানেল রয়েছে। সেই সঙ্গে অনলাইন নিউজপোর্টাল, অনলইন পত্রিকার ছড়াছড়ি। এ কারণে মিডিয়া সুপারভিশন না থাকায় হলুদ সাংবাদিকতাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। এজন্য নীতিমালা ফলো করা একান্ত জরুরি। আমার জানা মতে, প্রধান প্রধান সব হাউসের নিজস্ব নীতিমালা আছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের দেওয়া নীতিমালা আছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্যও সরকার নীতিমালা তৈরি করেছে। সমস্যা হলো, হাউসগুলো তা বাস্তবায়ন করছে কি না সেটি। এজন্য কঠোর ফলোআপ দরকার। এজন্য নিজেদেরও পরিচ্ছন্ন ও পেশাদারি হতে হবে। দেশের প্রতি তাদের কমিটমেন্ট থাকতে হবে।

হলুদ সাংবাদিকতাকে কখনোই সুষ্ঠু সাংবাদিকতা বলা যাবে না। এই অপসাংবাদিকতা আমাদের এ পেশাকে কলঙ্কিত করছে। আর নীতিমালা নিয়ে প্রত্যেক হাউসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকা দরকার। সেই সঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মিডিয়ার প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করতে হবে।

সাংবাদিকতা পেশা এবং এই পেশার নেতৃত্ব দেওয়া অর্থাৎ ইউনিয়নের নেতৃত্বে থাকা এ দুইয়ের মধ্যে আপনার সাফল্য আর ব্যর্থতা কতটুকু?

মো. শাহ আলমগীর: একসময় ইউনিয়ন এক ছিল। যে কারণেই হোক সেটি আর এক থাকেনি। আমি নেতৃত্ব দিয়েছি স্বাধীনতার সপক্ষের অংশে। তখন ইউনিয়নে এখনকার মতো এত সদস্য ছিল না। কিন্তু রাজধানী ঢাকাসহ জেলায় জেলায় আমি ও অন্য সাংবাদিক নেতারা ব্যাপক কর্মতৎপরতার কারণে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ এখন। ইউনিয়নে তাঁদের সদস্যপদ বেশি। প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই সাংবাদিকদের বিপুলসংখ্যক উপস্থিতি আমাদের গর্বিত করে। এ পেশা থেকে আলবদর-রাজাকারদের অপসারণ, আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম। আমি বা আমরা চেয়েছিলাম সাংবাদিকদের জন্য সম্মানজনক ওয়েজ বোর্ড চালু হোক। এটিও আলোর মুখ দেখেছে। এখন নবম ওয়েজ বোর্ড দিয়েছে সরকার। এ দুটিকে আমি আমার বা আমাদের প্রধান সাফল্য মনে করি।

আর ব্যর্থতা হচ্ছে, এত আন্দোলন করে যে ওয়েজ বোর্ড চালু হলো, তার সুফল অধিকাংশ সাংবাদিক পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে মালিক-কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত থাকছে। প্রায়ই শোনা যাচ্ছে নামিদামি সংবাদপত্র ও চ্যানেল থেকে সিনিয়র সাংবাদিক ছাঁটাইয়ের খবর। ছাঁটাইয়ের পরে তাদের পাওনা ঠিকমতো পরিশোধ করা হচ্ছে না। আরেকটি ব্যর্থতা হচ্ছে– কোনো নীতিমালার তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের আত্মপ্রকাশের ঘটনা। যেখানে মানসম্মত সাংবাদিকতা হয় না। ইউনিয়নের কোনো ইউনিট নেই। এর দায় আমরা এড়াতে পারি না।

দেশে যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে তাতে সুষ্ঠু সাংবাদিকতার গতিরুদ্ধ হবে কি?

মো. শাহ আলমগীর: এ বিষয়টি নিয়ে অনেকের মধ্যে ভয়, শঙ্কা, দ্বিধা রয়েছে। আসলে আমাদের বর্তমান সরকার উন্নয়নমুখী সরকার। দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়– এমন কর্মপ্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সরকারের উদ্দেশ্য। যারা দেশের উন্নয়ন চায় না, তারা শঙ্কিত। যারা হলুদ সাংবাদিকতা করে, তারা ভীত। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, এখনও করছে, তারা ভীত। যারা নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করে, তাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আসলে সবকিছুর একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। অনেকটা নীতিমালার মতো।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এমডি আপনি। সাংবাদিকদের কল্যাণে এ সংস্থা কতখানি দায়িত্বশীল?

মো. শাহ আলমগীর: আমি আগেই বলেছি, বর্তমান সরকার উন্নয়নমুখী সরকার। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল। তিনি ও তাঁর সরকার সাংবাদিকবান্ধব। সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত বা আগে যুক্ত সেসব অসচ্ছল সাংবাদিককে এই ট্রাস্ট থেকে ভাতা দেওয়া হয়। যারা সাহায্য পেয়েছে তারা কৃতজ্ঞ সরকারের প্রতি। এ ভাতার কারণে অনেক সাংবাদিক কারও দয়া বা করুণা না নিয়ে তাঁদের চিকিৎসা করাতে পেরেছে। অন্যান্য খরচ চালাচ্ছে। তাঁদের কারও কাছে করুণার পাত্র হতে হচ্ছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ফান্ডকে আরও সম্প্রসারিত করার ওয়াদা করেছেন। এর আগে কোনো সরকার সাংবাদিকদের নিয়ে এতটা গভীরভাবে ভাবত না। আর এ ফান্ডকে স্বচ্ছ রাখার ব্যাপারে আমি আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

একসময় চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করতেন। এ মাধ্যমটিতে একবারেই দেখা যাচ্ছে না, কেন?

মো. শাহ আলমগীর: আমি মনে করি, চলচ্চিত্র সবচেয়ে বড়ো শিল্পমাধ্যম। যার গ্রহণযোগ্যতা বেশি। 'অবিচার' ছবিটির সঙ্গে কাজ করার সময় মনে হয়েছিল, আমি এটিকেই অর্থাৎ পরিচালনাকে পেশা হিসেবে নেব। কিন্তু ছিলাম বাবার বড়ো ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবার। অনেক স্বাধীনতা পরিবার আমাকে দিলেও চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল। বিয়ের পর স্ত্রী আমার সাংবাদিকতা পেশাটাকেই গুরুত্ব দিত। আর ওই সময়টাতে চলচ্চিত্রে তেমন সুবাতাস ছিল না। বোম্বের কাটপিছ, ভায়োলেন্স ছিল প্রধান বিষয়, যা আমাকে টানছিল না।

তবে এখন সেই পরিবেশ অনেক বদলে গেছে। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। ভালো ছবি নির্মিত হচ্ছে। সরকার অনুদান দিচ্ছে। এ পরিবেশটা তখন পেলে হয়তো ছবির জগতেই থেকে যেতাম।

আপনার সাফল্যের নেপথ্য শক্তি কে বা কারা?

মো. শাহ আলমগীর: অবশ্যই আমার পরিবার। বিশেষ করে স্ত্রী ও দুই সন্তান।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, গবেষক, সাংস্কৃতিক কর্মী

সাংবাদিক নির্যাতন ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা

মো. শাহ আলমগীর

ভূমিকা

মানবীয় সভ্যতা সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় ছিল নিরাপত্তা। নিরাপত্তা নির্মিত হয়েছে নিরাপত্তাহীনতার ওপর ভিত্তি করে। বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল সমাজ নির্মাণের পেছনে থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস এবং সিনথিসিসকে[১] গুরুত্ব দিয়েছেন। আরেক দার্শনিক প্রুধোঁ হেগেলের সমাজ নির্মাণের ধারাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন– ক. ভালো, খ. মন্দ। মন্দকাজ আমাদের মধ্যে ভালো হওয়ার তাড়না সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মানবীয় সমাজের নিরাপত্তাহীনতাই আমাদের নিরাপত্তা অর্জনের দিকে ধাবিত করেছে। বন্য পশুপাখি, জন্তু-জানোয়ারদের আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্যই মানুষ প্রথম নিরাপত্তার বিষয়টি চিন্তা করে। মৌলিক নিরাপত্তা[২] নিশ্চিত হওয়ার পর মানুষের অন্যতম প্রচেষ্টা মানবীয় সমাজ তৈরি করা। আমাদের সভ্যতাকে আরও মানবীয় পর্যায়ে ধাবিত করতে অনেক লেখকই সংগ্রাম করেছেন। লেখকদের এই সংগ্রাম সম্পর্কে বিনয় ঘোষ দুটি বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একদল লেখক আছে যারা সমাজ থেকে পালাতে চান বলেই তারা লিখে থাকেন। আরেক দল আছে যারা বলেন, সমাজ থেকে পালানো যায় না। সমাজ থেকে পালাতে হলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে অথবা পাগল হতে হবে। তাই তারা সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে, ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সংগ্রাম করতেই লিখে থাকেন (ঘোষ, ১৯৯৭)। সাংবাদিক এই দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

'কাম্য গণতন্ত্র' নিশ্চিতকরণ, 'স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ', 'দুর্নীতি', 'অবৈধ আর্থিক লেনদেন' প্রতিরোধকরণ, এমনকি যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট মহামারি প্রতিরোধে গণমাধ্যম তথা সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অমর্ত্য সেন এক্ষেত্রে বলেন, মুক্ত প্রেস ও সক্রিয় রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ, একটি দেশে যেখানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে, সেখানে সর্বোচ্চ পূর্বাভাসব্যবস্থার মতো কাজ করে থাকে (Sen, 1999)।

উল্লিখিত ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যর্থ হলেই গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বরাবরই গণমাধ্যমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, গণমাধ্যম দলীয়

'কাম্য গণতন্ত্র' নিশ্চিতকরণ, 'স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ', 'দুর্নীতি', 'অবৈধ আর্থিক লেনদেন' প্রতিরোধকরণ, এমনকি যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট মহামারি প্রতিরোধে গণমাধ্যম তথা সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে

রাজনীতির শিকার, গণমাধ্যম কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ল্যাপডগ, তেল সাংবাদিকতা, সাংবাদিকদের রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু সাংবাদিক নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়। ২০১৭ সালে এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৪৪ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এদের বেশির ভাগই রাজনৈতিক কারণে এবং যুদ্ধবিষয়ক বিট কাভার করতে গিয়ে হত্যার শিকার হন। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ২০১৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে সমকালের সাংবাদিক আবদুল হাকিম শিমুলকে হত্যা করা হয় (CPJ, 2017)।

কিন্তু প্রশ্ন হলো– সাংবাদিকদের তাহলে কেন হত্যা করা হচ্ছে? কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টের তথ্যমতে, রাজনৈতিক সংবাদ, মানবাধিকারবিষয়ক সংবাদ, দুর্নীতিবিষয়ক প্রতিবেদন, অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন এবং যুদ্ধ বিট কাভার করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক নিহত হন। (CPJ, 2017)। তাহলে মানবীয় সভ্যতা তৈরির পথ কি এখন বন্ধ হয়ে যাবে? সাংবাদিক কি তাহলে আর সত্য, নির্ভীক সংবাদ পরিবেশন করবেন না? সাংবাদিক যেন সত্য ও নির্ভীক সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

সাংবাদিকের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নজরদারি। রাষ্ট্রের অন্যান্য তিনটি স্তম্ভে গণমাধ্যমকে চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকার করে। তিনটি স্তম্ভের সঙ্গে গণমাধ্যমের মৌলিক পার্থক্য হলো– গণমাধ্যম সক্রিয়। ফলে গণমাধ্যম রাষ্ট্রের ওপর নজরদারি ও খবরদারি করে থাকে। যে কারণে গণমাধ্যমকে গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের আয়না বা দর্পণ বলা হয়ে থাকে। আর গণমাধ্যমের সঠিক দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় কাম্য গণতন্ত্র। যে কারণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকের নিরাপত্তা অতীব জরুরি। সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে ব্যারি জেমস ইউনেস্কো থেকে প্রকাশিত 'Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, সন্ত্রাসের দ্বারা সাংবাদিক নিহত বা আহত হলে মানবতার একজন পর্যবেক্ষক কমে যায়। ভীতিকর এবং স্ব-সেন্সরশিপ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যেকটি আক্রমণকে বাস্তবতা থেকে বিভ্রান্ত করা হয়। (James, 2002)। এরকম পরিস্থিতিতে ইউনেস্কো থেকে 'UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সাংবাদিক নির্যাতনের বেশকিছু কারণ উল্লেখ করা হয়। কারণগুলো হলো (UNESCO, 2008):

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ক্রমবর্ধমান সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন সবার মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি গ্রেফতার, কারাদণ্ড, বিচারের হুমকি ইত্যাদি সাংবাদিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছে। ফলে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি আন্তসরকারি সংস্থা, পেশাগত সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইউনেস্কো, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে), রিপোর্টার্স স্যান্স ফ্রন্টায়ার্স (আরএসএফ), দি ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেফটি ইনস্টিটিউট (আইএনএসআই), দি ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এক্সচেঞ্জ (আইএফইএক্স) এবং দি ইন্টার আমেরিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (আইএপিএ) থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসংখ্য সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন।

আইএফইএক্সের তথ্যমতে, সাংবাদিক নির্যাতনের ১০টি মামলার মধ্যে নয়টিরই কোনো আসামি খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার রক্ষায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদান এবং হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করা প্রয়োজন। মতপ্রকাশের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা, জনগণের মতামত, অংশগ্রহণ এবং গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে জনগণ স্বশাসিত হবে এবং টেকসই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের নিশ্চয়ন ঘটানো গেলে জনগণের গুণগত তথ্যে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে। আর জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার গণতান্ত্রিক সুশাসন, দারিদ্র্য কমানো, পরিবেশ সংরক্ষণ, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সুবিচার এবং মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৬ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি রেজুলেশন পাস করে। এ রেজুলেশনটি কার্যকর করার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। ১৯৪৫ সালের ইউনেস্কো সংবিধানের আর্টিকেল ১-এ বলা হয়েছে, শব্দ ও ছবির দ্বারা মানুষের ধারণা প্রকাশে জাতিসংঘ কাজ করে যাবে।

নির্যাতনের কারণ প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন

প্রতিবেদন রচনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু হলো (মঞ্জু ও স্নিগ্ধা, ২০০২)–

- প্রশাসনিক বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা
- সন্ত্রাস ও অরাজকতার ওপর প্রতিবেদন রচনা
- পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে হত্যা

প্রশাসনিক বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা

- সরকার কর্তৃক জমির ন্যায্য বণ্টনবিষয়ক অনিয়মের ওপর প্রতিবেদন লেখা
- চোরাচালানবিরোধী প্রতিবেদন লেখা
- মেয়রের দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ
- সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির চালচিত্র প্রকাশ
- প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অপশাসন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখালেখি
- প্রশাসনের বিপক্ষে রাজনৈতিক প্রতিবেদন রচনা
- সরকারের রাজনৈতিক ও ব্যাংকিং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখালেখি
- সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মাদকদ্রব্য পাচার এবং পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা
- সরকারি দুর্নীতির কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ করা
- প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও সমালোচনার জন্য
- স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করা

সন্ত্রাস ও অরাজকতার ওপর প্রতিবেদন রচনা

- পুলিশি সন্ত্রাসের ছবি তোলার জন্য
- কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ
- মাফিয়াদের আক্রমণ
- সন্ত্রাসবিরোধীদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহকালে
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড সাংবাদিকতার জন্য

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নজরদারি। রাষ্ট্রের অন্যান্য তিনটি স্তম্ভে গণমাধ্যমকে চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকার করে। তিনটি স্তম্ভের সঙ্গে গণমাধ্যমের মৌলিক পার্থক্য হলো– গণমাধ্যম সক্রিয়। ফলে গণমাধ্যম রাষ্ট্রের ওপর নজরদারি ও খবরদারি করে থাকে। যে কারণে গণমাধ্যমকে গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের আয়না বা দর্পণ বলা হয়ে থাকে

- জুয়া, মাদক পাচার, অস্ত্রধারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সম্পর্কে অবাধে তথ্য প্রকাশ
- পুলিশ, ড্রাগ পাচারকারী চক্রের গোপন আঁতাত ফাঁস
- মাদক পাচারে পুলিশের সহযোগিতার বিষয়ে প্রতিবেদন লেখা
- সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিবেদন লেখা
- বাসা ভাড়া বৃদ্ধি ও লুটতরাজের ওপর তথ্য সংগ্রহ
- কৃষক হত্যার ওপর প্রতিবেদন রচনার জন্য
- বিদ্রোহীদের গুলিতে মৃত্যু

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতবিষয়ক প্রতিবেদন রচনা

- বামপন্থিদের গেরিলা আক্রমণের শিকার
- মিছিলে তথ্য সংগ্রহকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে
- বিদ্রোহী সৈন্যদের গুলিতে মৃত্যু
- মুক্তিকামী সৈনিকদের তীব্র সমালোচনার জন্য
- ভোট জালিয়াতি ও নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপের সমালোচনা করার দায়ে
- ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিবেদন রচনা করায় মৌলবাদীদের হাতে নিহত
- বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমালোচনা করে লেখালেখির দায়ে
- রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আক্রমণে
- সহযোগী সাংবাদিক বন্ধুর হত্যা তদন্তের ওপর লেখালেখি
- পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এলোপাতাড়ি গুলির শিকার
- সৈন্যদের লুটপাটের সময় তথ্য সংগ্রহকালে

পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে হত্যা

- যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকালে বুলেটবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ
- ছিনতাই ও পরে মুক্তিপণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশের জন্য
- যুদ্ধক্ষেত্রে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু
- মিথ্যা সন্দেহে হত্যা
- আদালতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অপ্রত্যাশিত মৃত্যু
- পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা
- সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে
- সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করার অভিযোগে
- তথ্য সংগ্রহকালে ক্রসফায়ারে মৃত্যু
- ঘরের মধ্যে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা
- অন্যের সুইসাইড বোমায় মৃত্যু
- কথিত নিষিদ্ধ তথ্য আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সন্দেহজনক হত্যা

সাংবাদিক নির্যাতন

পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের বাধাদানকেই নির্যাতন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের তথ্যানুসারে, ১৯৯২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ১,৮৫০ সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,২৫৩ জনকে হত্যার কারণ জানা গেছে। বাকি ৪৯৩ জনকে হত্যার কোনো উৎস জানা যায়নি। নিহত সাংবাদিকদের ৫৮২ জন রাজনৈতিক কারণে মারা গেছেন। এছাড়া যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নিহত হন ৫২১ সাংবাদিক। মানবাধিকার রক্ষায় ২৬৫ জন, দুর্নীতিবিষয়ক তথ্য পরিবেশনের কারণে ২৫৫ জন, অপরাধবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের কারণে ১৯৭ জন সাংবাদিক নিহত হন। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৪ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। নিহতের ঘটনা ছাড়াও সারা বিশ্বে ৫৫ সাংবাদিক নিখোঁজ রয়েছেন। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বে ২৫৯ সাংবাদিক জেলে আটক রয়েছেন।

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশে ১৯৯২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৩০ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ জনকে হত্যার কারণ এখনও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। ২০১৭ সালে একজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশে অপরাধ ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত সংবাদ কাভার করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ২১ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। দুর্নীতিবিষয়ক সংবাদ কাভার করতে গিয়ে সাতজন, মানবাধিকার রক্ষায় ছয়জন নিহত হন। তবে সাংবাদিক নিহতের ক্ষেত্রে শুধু সাংবাদিকতাই একমাত্র কারণ নয়। এর পেছনে রয়েছে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার চেয়ে ব্যক্তিগত কারণেই বেশির ভাগ সাংবাদিক নিহত ও নির্যাতিত হয়ে থাকেন।

এমএমসি পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের সাংবাদিক নির্যাতিত হন চারটি গোষ্ঠী দ্বারা (মঞ্জু ও স্নিগ্ধা, ২০০২)–

ক. রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতন
খ. পত্রিকা মালিকদের নির্যাতন
গ. সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির নির্যাতন
ঘ. পারিবারিক পর্যায় থেকে নির্যাতন

এই নির্যাতনের ধরনগুলো নিম্নরূপ :

- মালিকপক্ষ বা সম্পাদকীয় বিভাগ যখন কোনো প্রতিবেদককে একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন সম্পাদনার নামে সম্পূর্ণভাবে সেন্সর করেন, তখন তা যেমন একধরনের নির্যাতন, অন্যদিকে সংবাদকর্মীর মতামত প্রকাশে বাধাদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন, অপকৌশলে তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও সাংবাদিক নির্যাতনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে
- সাংবাদিকের ওপর পুলিশি হয়রানি, হামলা, মামলা, গ্রেফতার, হত্যা ও অপহরণ
- পত্রিকা থেকে বেতন না পাওয়া
- রাজনৈতিক ও সামাজিক অপশক্তির দাপট
- টেলিফোনে হুমকি প্রদান
- পারিবারিক সদস্যদের ভয়ভীতি প্রদর্শন
- প্রশাসন ও প্রভাবশালী মহলের চাপ প্রয়োগ
- মানহানির মামলা দায়ের করা

সাংবাদিকের নিরাপত্তা বা সুরক্ষা দেওয়ার উপায়

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে কিছু সুপারিশ:

- সাংবাদিকদের বেতন নিয়মিত ও সন্তোষজনক হওয়া উচিত
- রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন বন্ধ করা উচিত
- সাংবাদিক পারিতোষিক বা অর্থের কাছে যেন নিজেদের বিকিয়ে না দেন
- পেশাগত প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দরকার
- নির্যাতন রোধে আইনের ভূমিকা কার্যকর হওয়া দরকার
- পত্রিকাগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত
- সরকারের এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত আইন ও সহায়তা থাকা দরকার
- সুন্দরভাবে রিপোর্ট লেখা সহজ নয়। এজন্য নিজ নিজ পত্রিকা, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি), প্রেস কাউন্সিল উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে
- প্রত্যেক সাংবাদিককেই পরিপূর্ণ সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে
- গণমাধ্যমের শীর্ষ কর্মকর্তাদের তাদের অধীনস্তদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সুনজর দিতে হবে
- প্রয়োজনে বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো যেতে পারে
- নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে সত্য প্রকাশে নির্লিপ্ত থাকলে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে না নেওয়াই ভালো
- সাংবাদিককে সত্য বলার সাহস ও সততা থাকতে হবে। ভালো বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে
- প্রশাসনিক ও সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে
- পর্যাপ্ত আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে এমন আইন বাতিল করতে হবে
- সাংবাদিক ইউনিয়ন হওয়া চাই নিরপেক্ষ, কার্যকরী ও ঐক্যবদ্ধ
- রিপোর্টার থেকে সম্পাদক, সর্বস্তরের কর্মীদেরকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত
- সুবিধাবাদী মনোভাব দূর করতে হবে
- তথ্যসূত্র সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য হতে হবে
- প্রশাসন ও পুলিশকে সহায়তা করতে হবে
- সাংবাদিক সমাজের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিধাবিভক্তি নিরসন ঘটাতে হবে

সংবাদ সংগ্রহ করার সময় সাংবাদিককে নিরাপত্তা বিধানের উপায়

- সংঘর্ষের সংবাদ সংগ্রহের সময় অবশ্যই সাংবাদিককে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট পরে যেতে হবে

- নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে সংঘর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে
- ক্যামেরাম্যানদের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্সযুক্ত ক্যামেরা ব্যবহার করতে দিতে হবে। যেন দূর থেকেই প্রকৃত ঘটনার সুস্পষ্ট ছবি/ভিডিওচিত্র সংগ্রহ করতে পারে
- সংঘর্ষের সময় পুলিশ/সেনাবাহিনী কিংবা সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা বাহিনীর দেওয়া নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে না
- সংবাদ সংগ্রহের সময় মনে রাখতে হবে– 'নিরাপত্তা সর্বাগ্রে'

হুমকিপ্রাপ্ত সাংবাদিককে নিরাপত্তা বিধান

- পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিক প্রায়ই মেরে ফেলার অথবা অঙ্গহানির হুমকিধমকি পেয়ে থাকে। হুমকিধমকি প্রাপ্ত সাংবাদিকের জন্য নিরাপত্তা সেলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেখানে সাংবাদিক নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন
- হুমকি পাওয়া মাত্র আইনি সহায়তা প্রদান করা
- যেসব সাংবাদিককে মামলা সংক্রান্ত হয়রানি করা হচ্ছে, তাদেরকে আইনজীবীর মাধ্যমে মামলার কাজে সহায়তা করা
- হামলা বা আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশি সহায়তা প্রদান
- হুমকিদাতা অথবা নির্যাতনকারীর শাস্তি নিশ্চিতকরণ

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে জাতিসংঘের কৌশল

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে জাতিসংঘ বেশ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। সেই কৌশলগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

জাতিসংঘের কৌশল শক্তিশালী করা

জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেই ঘটনাগুলো প্রতিরোধে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবসের মতো দিনগুলোয় বিশেষ তথ্য প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ জাতিসংঘের যে সংস্থাগুলো মুক্ত মতামত প্রকাশের অধিকার নিয়ে কাজ করে, তাদের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা গ্রহণ

জাতিসংঘ মুক্ত মতামত নিশ্চিত করতে তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহযোগিতা করবে। বলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়, সেসব অপরাধের বিরুদ্ধে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য চাপ দেবে। বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাগুলো প্রয়োগ, আইনের উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তাসূচক জাতীয় আইন প্রয়োগে সহযোগিতা করবে। ১৯৯৭ সালের ১২ নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ২৯ নম্বর রেজুলেশনে সাংবাদিকদের সহিংসতার বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সাংবাদিকদের নিরাপত্তাসূচক আইপিডিসির সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে উৎসাহ দেবে জাতিসংঘ।

অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্বমূলক কাজ

জাতিসংঘ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে দেশীয়, আঞ্চলিক, আন্তসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্বমূলক কাজ করবে। এছাড়া জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে সিভিল সোসাইটি, পেশাগত সংস্থাগুলোকে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সহযোগিতা করবে।

সচেতনতা বৃদ্ধি করা

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব এবং গণমাধ্যম পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে জাতিসংঘ বিভিন্ন বিদ্যমান নিরাপত্তা বিধিমালা সাংবাদিক, গণমাধ্যম মালিক, এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে পাঠাবে। সাংবাদিকতায় শিক্ষা দেয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তাবিষয়ক পাঠক্রম উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি দিয়ে সহায়তা করবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তাবিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সবার মধ্যে বিতরণ করবে।

নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ লালনপালন করা

নিরাপত্তাবিষয়ক তথ্য পাঠানো আর সহযোগিতা করলেই হবে না, এটিকে লালনপালনও করবে জাতিসংঘ। শুধু সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা, জীবন বিমাই নয়, এর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা এবং ফ্রিল্যান্স ও পূর্ণকালীন সাংবাদিকদের পর্যাপ্ত সম্মানির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয় সম্পর্কে সাংবাদিকদের নিরাপত্তাবিষয়ক সব স্টেকহোল্ডারের উদ্যোগগুলোকে লালনপালন করবে জাতিসংঘ। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে যুদ্ধরত এলাকায় 'মিডিয়া করিডর' নামে এলাকা সৃষ্টি করবে, যেখান থেকে সাংবাদিক নিরাপদে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। আর এক্ষেত্রে জাতিসংঘ কাজ করবে।

উপসংহার

গণমাধ্যম দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করছে। 'কাম্য গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় জবাবদিহিতামূলক সংস্কৃতি গঠনে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে গণমাধ্যম। দুর্নীতি কমিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠী তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং গণমাধ্যমকে ল্যাপডগ হিসেবে লালনপালনের জন্য প্রায়ই সাংবাদিক নির্যাতন করছে। ফলে প্রতিবছর স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষায় সাংবাদিক তাদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রদের সহযোগিতায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চয়নের পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতাও নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে সাংবাদিক, গণমাধ্যম মালিক, সম্পাদক, সাধারণ মানুষকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন না করা পর্যন্ত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধান করা প্রায় অসম্ভব। যে কারণে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সচেতনতাই সর্বাগ্রে।

তথ্যসূত্র

১. করিম, সরদার ফজলুল (২০১২), দর্শনকোষ, ঢাকা: প্যাপিরাস
২. ঘোষ, বিনয় (১৯৯৭), শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী
৩. মঞ্জু, কামরুল হাসান, স্নিগ্ধা, জন্নাতুল ফেরদৌস (সম্পাদিত) (২০০২), গণমাধ্যম ও সমাজ, ঢাকা: ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার
৪. James, B. (2002). Press Freedom: Safety of Journalist and Impunity. UNESCO Publications.
৫. Sen, A. (1999). Development and Freedom. New York: Anchor Books.
৬. CPJ. (2017, October 06). Retrieved from: Committee to Protect Journalist: https://cpj.org/killed/2017/
৭. UNESCO. (2008, October 08). Retrieved from:
৮. http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc28_un_action_plan_safety_approved.pdf

১. বস্তুজগতে নিত্যপ্রবাহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক হচ্ছে প্রতিশক্তির দ্বন্দ্ব বা বিরোধে সম্পর্ক। বিরোধ হচ্ছে বস্তুজগতের গতির মূল নিয়ামক। বিরোধ বা দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বস্তুজগতের বিকাশকে সাধারণত ইংরেজিতে থিসিস, অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথিসিসরূপে প্রকাশ করা হয়। দ্বন্দ্বমান দুটি বস্তুর একটিকে থিসিস এবং অপরটি অ্যান্টিথিসিস বলা হয়। থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্ব নিষ্ফলভাবে কার্যরত থাকে না। এই দ্বন্দ্ব কালক্রমে বস্তুর মধ্যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। এই নতুন অবস্থাকে সিনথিসিস বলা হয়। (করিম, ২০১২)

২. আমাদের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা হলো অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান। মৌলিক নিরাপত্তা বলতে এখানে পশুপাখি, দুর্যোগ ইত্যাদি থেকে মানুষের বেঁচে থাকা বোঝানো হয়েছে। আর মানবীয় সভ্যতা বলতে বোঝানো হয়েছে, সব মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ।

লেখক: সাবেক মহাপরিচালক, পিআইবি

সাংবাদিকের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক ভাবনা

কুদরত-ই-মওলা

সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের ভাবনাগুলো এক করলে যে চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাতে মনে হবে আমরা এক আদর্শ সমাজে বাস করছি কিংবা তেমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখছি। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকসহ সমাজ-সচেতন সুশীলসমাজের অন্যান্য পেশার লোকজনের ভাবনাও তেমনই। কারণ তারা সবাই চান সুন্দর সমাজ গড়তে।

বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার দিকনির্দেশনাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে সংশ্লিষ্ট ভাবনাগুলো জানা যায়:

জাতিসংঘ: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২ নভেম্বরকে বিশ্ব সাংবাদিকবিরোধী সহিংসতা নির্মূল দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ২০১৪ সালে পরিষদ এ সিদ্ধান্ত নেয়। মালিতে ২০১৩ সালে ২ নভেম্বর দুজন কর্মরত ফরাসি সাংবাদিক নিহতের ঘটনাকে স্মরণ করে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এ প্রস্তাবে যেসব বিষয় আসে তা হলো: বিশ্বের সব সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীর ওপর আক্রমণ ও সহিংসতার প্রতিবাদ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা এবং সহিংসতার কারণে ক্ষতির প্রতিকার পাওয়ার ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা। সেই সঙ্গে এই সম্মেলন থেকে সাংবাদিকদের স্বাধীন ও বাধাহীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এ সিদ্ধান্ত ছাড়াও মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিকভাবে ইতোমধ্যে বেশকিছু আইন করা হয়েছে, যাতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো একমত হয়েছে। এসব আইন বা সিদ্ধান্ত প্রায় সব দেশের জন্য প্রযোজ্য বা প্রতিটি দেশ তা মানতে বাধ্য। সেগুলো হচ্ছে: ১. ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস (১৯৪৮), ২. জেনেভা কনভেনশন (১২ আগস্ট ১৯৪৮), ৩. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনেশন অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬), ৪. ইউএন হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল রেজুলেশন (২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২), ৫. ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজুলেশন-১৭৩৮ (২০০৬) এবং ৬. ইউএন প্ল্যান অব অ্যাকশন অন সেফটি অব জার্নলিস্টস অ্যান্ড ইস্যুজ অব ইম্পিউনিটি (২০১২)।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২ নভেম্বরকে বিশ্ব সাংবাদিকবিরোধী সহিংসতা নির্মূল দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ২০১৪ সালে পরিষদ এ সিদ্ধান্ত নেয়। ... দুজন কর্মরত ফরাসি সাংবাদিক নিহতের ঘটনাকে স্মরণ করে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়

জাতিসংঘের আরও দুটি অঙ্গসংগঠনের ভূমিকার কথা না বললেই নয়। তার মধ্যে রয়েছে ইউনেস্কো ও হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল। মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠায় তাদের কাজের ধারা-পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

ইউনেস্কো: সাংবাদিকের নিরাপত্তার বিষয়টি মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে তারা মনে করে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে আক্রমণের শিকার হয়ে প্রতি পাঁচ দিনে একজন সাংবাদিক মারা যান। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে– হত্যা, অপহরণ, নাজেহাল করা, অবৈধভাবে গ্রেফতার ও ডিটেনশন।

সংস্থাটি তাদের পর্যবেক্ষণে বলছে, সাংবাদিকের ওপর সহিংসতা ও সেলফ সেন্সরশিপ মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার পথে সরাসরি প্রতিবন্ধক। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা 'ইউএন প্ল্যান অব অ্যাকশন অন দ্য সেফটি অব জার্নালিস্টস অ্যান্ড ইস্যুজ অব ইমপিউনিটি'-এর অধীনে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিয়ে ছয়টি দিকনির্দেশনা ঠিক করেছে: ১. মান নির্ধারণ ও নীতি প্রণয়ন, ২. জনসচেতনতা বাড়ানো, ৩. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা, ৪. সক্ষমতা বৃদ্ধি, ৫. গবেষণা পরিচালনা, ৬. বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে এ বিষয়ে একটি মোর্চা গড়ে তোলা। ওই দিকনির্দেশনা জাতিসংঘের ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা অ্যান্ড সাসটেইনেবল গোলের অধীনে একটি উদ্যোগ– অর্থাৎ ২০৩০ সাল নাগাদ তারা সাংবাদিকের প্রতি সহিংসতা বা নিপীড়নকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসায় প্রত্যাশী।

হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল: তাদের সাম্প্রতিক এক সভায় বছর দুয়েক আগে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। তাতে নারী সাংবাদিকসহ পেশাজীবী গণমাধ্যমকর্মীদের সহিংসতার শিকার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছে:

১. সাংবাদিকের ওপর আক্রমণ করে যাতে কেউ পার না পায় এবং সাংবাদিকের নিরাপত্তায় রাষ্ট্রের প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থাকে জোরদার করা।
২. নির্বাচনসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে কর্মরত সাংবাদিকের নিরাপত্তা এবং বিনাবিচারে বা অন্যায়ভাবে আটক কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি।
৩. ডিজিটাল মাধ্যমে কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীদের গোপনীয়তা রক্ষাসহ নির্বিঘ্নে কাজের নিশ্চয়তা।
৪. পেশাগত মানোন্নয়নে জাতিসংঘ ও ইউনেস্কোসহ অন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতা প্রসার।
৫. সাংবাদিকের নিরাপত্তা ও মামলার বিষয়ে জানানোর বাধ্যবাধকতায় মানবাধিকার কমিশনের নিয়মিত নজরদারি। বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের দাবি জানিয়েছে।

জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠন ছাড়াও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইউরোপের অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ (ওএসসিই) ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন সিপিজে। এ দুটির কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

ওএসসিই: সাংবাদিকের নিরাপত্তা তথা দাবির ব্যাপারে সোচ্চার যেকটি সংস্থা তার একটি ইউরোপভিত্তিক সংস্থা 'অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ' (ওএসসিই)। সাংবাদিকের নিরাপত্তায় তারা ১৬ দফা নির্দেশনা ঠিক করছে। সেগুলো হলো:

১. জাতীয় সংবিধানের আলোকে মানহানি, হয়রানিসহ যেসব বিষয় দেশের আইনে অপরাধ, তা প্রকাশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।
২. আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে অবাধ তথ্য সরবরাহ ও সাংবাদিকদের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
৩. অযথা ব্লকিং বা ফিল্টারিং নিরুৎসাহিত করে ইন্টারনেটের স্বাধীন ব্যবহার আদায় করা।
৪. মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার উপযোগী প্রশাসন গড়ে তোলা, যা সাংবাদিকের বাধাহীনভাবে সংবাদ সংগ্রহে সহায়ক হয়।
৫. মুক্ত গণমাধ্যম ও সাংবাদিকের ওপর আক্রমণের বিচার নিশ্চিতে শক্তিশালী ও স্বচ্ছ বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৬. নির্বাচিত প্রতিনিধির সমালোচনাকে স্বাগত জানানোর বিষয়টি নিশ্চিতে প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন কর্মকর্তাসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রক্ষায় কোনো আইন থাকলে তা বাতিল করতে হবে।
৭. প্রকৃত জনস্বার্থ ছাড়া সাংবাদিককে তার সংবাদের সূত্র উল্লেখ করতে বাধ্য করা বা চাপ সৃষ্টি কাম্য নয়।
৮. কোনো সংবাদ প্রচার নিয়ে মামলা হলে সেক্ষেত্রে সাংবাদিকের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেহেতু তারা জনস্বার্থেই সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন।
৯. পুলিশ ও জেলা প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রমে ব্যত্যয়ের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১০. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে মুক্ত সাংবাদিকতার পথে বাধা না হয়।
১১. রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে আইন প্রণয়ন।
১২. সংবাদ সংগ্রহে কোনো রকম বাধা বা বৈষম্য সৃষ্টি না করে সরকারি সংবাদ সম্মেলনসহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকের প্রবেশ নিশ্চিত করা।
১৩. গণমাধ্যমের মালিক হওয়ার ব্যাপারে স্বচ্ছতা রাখতে হবে, যাতে করে অসুস্থ প্রতিযোগিতা না হয় বা অযথা সাংবাদিক বা সম্পাদকের ওপর চাপ সৃষ্টির কারণ না হয়।
১৪. সংবাদপত্র প্রকাশ তথা সংবাদ প্রচার বা সরবরাহে নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করা।
১৫. অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও নীতিবহির্ভূত কাজে বাধ্য করা থেকে সংবাদমাধ্যমের মালিককে বিরত রাখতে আইন প্রণয়ন করা, যাতে করে সংবাদকর্মী প্রয়োজনে জমায়েত ও অধিকার রক্ষায় সাংবাদিক ইউনিয়নে যোগ দিতে পারে।
১৬. মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠায় ন্যায়পাল বা হিউম্যান রাইটস কমিশনের ভূমিকাকে সমর্থন করা।

সিপিজে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট

৪০ জন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাটি বিশ্বের যে কোনো জায়গায় সাংবাদিকের স্বাধীনতার নিরাপত্তা বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হলে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। গত বছর শেষদিকে সৌদি আরব বংশোদ্ভূত আমেরিকান সাংবাদিক জামাল খাশোগির তুরস্কে হত্যা নিয়ে প্রতিবাদ করেছে তারা এবং সম্ভাব্য চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের প্রতিনিধি রয়েছে। তবে সেদেশেরই সরকার তথা ট্রাম্প প্রশাসন, বছর খানেক আগে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সারাবিশ্বের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম গণমাধ্যম ও ব্লগ এবং তাতে নিয়োজিত ব্যক্তির নাম, ফোনসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের হোম ল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও সিপিজেসহ সেদেশের সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদ করেছে। কারণ এটি বাস্তবায়িত হলে বিশ্বের প্রায় তিন লাখ গণমাধ্যম সূত্র তাদের প্রত্যক্ষ নজরদারিতে আসবে।

মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার পথ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হওয়ায় জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর সিদ্ধান্ত ছাড়াও ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস ও জেনেভা কনভেনশনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন বা সিদ্ধান্তের আলোকে গণমাধ্যম সংক্রান্ত আইন রচনা করে থাকে। সংক্ষেপে, আন্তর্জাতিক এসব নীতিমালা মেনে চলার দিক থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে বলা দুষ্কর। যেমন– এদেশের সাংবাদিকরা পেশাজীবী ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। যদিও সাংবাদিক ইউনিয়নটি বর্তমানে দ্বিবিভক্ত থাকায় পেশাগত যাবতীয় বিষয়ে একমত হওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত তথ্য সংগ্রহে সাধারণত বাধার সম্মুখীন হতে হয় না সাংবাদিকদের। যেমন– সম্প্রতি রচিত হয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং সম্প্রচার আইন। এ আইন দুটি সংবাদ ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার অনুকূল হলেও কয়েকটি বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে সরকারের ভিন্নমত রয়েছে। অন্যদিকে, বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে গঠন করেছে তথ্য কমিশন, যার কাজ কেউ কোনো তথ্য সংগ্রহকালে বিরাগভাজন হলে বা বঞ্চিত হলে কমিশন তা সমাধানে সহায়তা করবে এবং সেই অনুযায়ী সংগঠনটি স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিশেষে মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা তথা সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিয়ে যে কোনো আলোচনায় বাংলাদেশের অবস্থান কেমন বিষয়টি এসে যায়। বাস্তবে বলা যায়, বাংলাদেশে নির্বাচনসহ অন্যান্য সহিংসতায় মৃত্যুর হার এবং হয়রানির পরিমাণ অন্যান্য দেশের চেয়ে কম। তবে তদন্তের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিসহ সার্বিকভাবে বিচারের ধীরগতির জন্য সাধারণ মামলাগুলোর মতোই প্রকৃত বিচার পেতে সময় লেগে যায়, যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া বা শাস্তি দেওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে যথেষ্ট।

লেখক: সাংবাদিক, সিএনই, ডিবিসি নিউজ টিভি

সাংবাদিক নিরাপত্তার নানা দিক

শিবলী নোমান

সাংবাদিক নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশ তথা এই ভূখণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অষ্টাদশ শতকে। ১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'-এর হাত ধরে যখন থেকে এই উপমহাদেশে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু, তখন থেকেই আসলে সাংবাদিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যায়। হিকির এই বেঙ্গল গেজেটে যখনই ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে কোনো তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তখনই হিকির এ গেজেট বা স্বয়ং হিকির ওপর নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হিকি বা হিকির বেঙ্গল গেজেট কোনোটিই এ উপমহাদেশে থাকতে পারেনি। বরং হিকির গেজেটে প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্যকে উপলক্ষ্য করে পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্রগুলোকে বিধিনিষেধে ফেলার জন্য একের পর এক কালো আইন প্রণীত হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলজুড়েই। এর ভেতর ফাইভ রেগুলেশনস, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, সেডিশন অ্যাক্টের মতো আইন উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসকদের ভেতর শুধু চার্লস ম্যাটকাফেই সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর আগে-পরের কোনো শাসকই তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করেননি বরং সংবাদপত্রকে একধরনের প্রতিযোগী হিসেবেই বিবেচনা করেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেছেন।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাংবাদিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার কথা বলে কেন সংবাদপত্রের ওপর নেমে আসা দমনপীড়ন বা চাপসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে। এর উত্তর হিসেবে বলা যেতে পারে, সবার আগে চিহ্নিত বা সংজ্ঞায়িত করতে হবে যে এখানে 'নিরাপত্তা' শব্দটি দ্বারা কী ধরনের নিরাপত্তাকে নির্দেশ করা হচ্ছে। এখানে 'নিরাপত্তা' কি শুধু দুর্বৃত্তের হামলা থেকে নিরাপত্তা? আমার মনে হয় না। অন্তত আমি মনে করি, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বা অনিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় শুধু একটি দিক নয় বরং অন্তত তিনটি আলাদা দিক আছে। প্রতিটি দিক নিয়েই আলোচনা করা হবে। তার আগে প্রাথমিক আলোচনায় আবারও ফিরে যাওয়া যাক।

ব্রিটিশ শাসকদের ভেতর শুধু চার্লস ম্যাটকাফেই সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর আগে-পরের কোনো শাসকই তাঁর ... বরং সংবাদপত্রকে একধরনের প্রতিযোগী হিসেবেই বিবেচনা করেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেছেন

পাকিস্তান আমলেও আমরা দেখেছি নানা সময় নানা ধরনের আইন-অধ্যাদেশ জারি করে সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া সামরিক শাসনের সময় প্রকাশ্যেই সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনা কর্তৃপক্ষ নিয়মিত সংবাদপত্রগুলোকে প্রেস-অ্যাডভাইজ দিয়েছে। একই কাজ করেছে ১/১১-পরবর্তী সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

এটি স্পষ্ট যে, আমি এ ধরনের চাপকেও সাংবাদিক নিরাপত্তার আলোচ্য ইস্যু হিসেবে মনে করি। আরও মনে করি, সাংবাদিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার চেয়ে সাংবাদিক অনিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা বেশি জরুরি। কারণ অনিরাপত্তাগুলো নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়গুলো বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারে এবং এর ফলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাধ্যমিক আলোচনায় প্রবেশ করা সহজ হয়। অন্তত তিন ধরনের নিরাপত্তা বা অনিরাপত্তার দিক আছে বলে মনে করি। এই দিকগুলো হলো:

* চাকরিজনিত অনিরাপত্তা
* আর্থিক অনিরাপত্তা
* পেশাগত অনিরাপত্তা

আমরা মূলত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ইস্যুতে পেশাগত কাজ করার সময় তারা যেসব অনিরাপত্তার সম্মুখীন হন, তা নিয়েই আলোচনা করে থাকি। এ বিষয়েই সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করা হয়ে থাকে। আমি মনে করি, তারও আগে সাংবাদিকদের চাকরিজনিত ও আর্থিক অনিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি। কারণ এই দুই ধরনের অনিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে আমাদের সাংবাদিক মহল কখনোই একটি সৃজনশীল শ্রেণিতে পরিণত হতে পারবে না।

চাকরিজনিত অনিরাপত্তা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের অর্থায়নে ২০১৮ সালে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল আলমের এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের সাংবাদিকদের ৯২ শতাংশ মনে করে যে, তাদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। এছাড়া ৫৭ শতাংশ সাংবাদিক কাজ করেন অতিরিক্ত চাপ নিয়ে। এই গবেষণায়,

> ... ঢাকা শহরের ১৫টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে কাজ করেন; যার ৯টি বাংলা ও ৬টি ইংরেজি। এছাড়া ২১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, দুটি বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, ৪টি অনলাইন সংবাদ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মোট ৪২টি সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে গবেষণা করেন সাইফুল আলম। তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩৩৪ জন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নেন তিনি। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ সাংবাদিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ... ৩৩৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩০৭ জন অর্থাৎ ৯২ শতাংশ মনে করেন সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। তাঁরা জানান, যে কোনো সময় চাকরি চলে যেতে পারে, আর চাকরি চলে গেলে অভিযোগ করার মতো সুযোগ নেই। টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের মধ্যে এ নেতিবাচক ধারণা সবচেয়ে বেশি। (এনটিভিবিডি, ২০১৮)

উপরিউক্ত গবেষণা থেকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থার একটি সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে বলা হয়েছে, টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে নেতিবাচক ধারণা সবচেয়ে বেশি। সৌভাগ্য হোক বা দুর্ভাগ্য, আমার বাংলাদেশের দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ গবেষণার ফল পুরোপুরি মিলে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোয় সংবাদকর্মী বা সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। একজন দক্ষ সাংবাদিকও নিশ্চয়তা দিয়ে আজ বলতে পারবেন না যে আগামীকাল কর্মস্থলে গিয়ে তিনি শুনবেন না যে অনিবার্য কারণে তার চাকরিটি আর নেই। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই চিত্র বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোতেই দেখা যায়।

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই চাকরিজনিত অনিরাপত্তার আবার দুইটি ধরন রয়েছে। প্রথমটি হলো ব্যক্তিগত অনিরাপত্তা। এটি নিয়ে আসলে আলোচনা করা হয়ে গেছে। একজন সাংবাদিক সবসময়ই জানেন যে, তার চাকরিটি যে কোনো সময় চলে যেতে পারে। সেটি হতে পারে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সংকোচন নীতির কারণে কিংবা সাংবাদিকের কোনো ছোটো বা বড়ো ভুলের কারণে কিংবা অদৃশ্য কোনো চাপের কারণে।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরনটি খুবই মারাত্মক, সেটি হলো কর্মস্থলের বা হাউসের বা প্রতিষ্ঠানের অনিরাপত্তা। বিভিন্ন সময় আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম হাউসকে বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছি। বছরখানেক আগে একদম আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায় সকালের খবর নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র। অর্থাৎ এক রাতের ব্যবধানে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব সাংবাদিক তাদের চাকরি হারিয়েছেন। তাহলে এ ধরনের অনিরাপত্তা কি অনিরাপত্তা নয়? জীবিকার প্রশ্নে অনিরাপত্তা নিয়ে একজন সাংবাদিক কতক্ষণ শতভাগ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে যেতে পারবেন? এক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো আমাদের গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতির। আমাদের দেশে বেসরকারি গণমাধ্যমের সংখ্যাগত বিকাশ হয়েছে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাত ধরে। একের পর এক সংবাদপত্র, টেলিভিশিন, রেডিও চ্যানেল চালু হয়েছে ব্যবসায়িক গ্রুপের মালিকানায়। ফলে গণমাধ্যম গণমানুষের মাধ্যম নয় বরং মুনাফাবৃদ্ধি ও নিজের ব্যবসায়িক অবস্থান ধরে রাখার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এরই ফল হিসেবে গণমাধ্যমকর্মীরাও তাদের প্রতিষ্ঠানের হতে পারেননি। এক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদেরও বিবেচনা করা হচ্ছে মুনাফাবৃদ্ধির হাতিয়ার বা নিতান্ত শ্রমিক হিসেবেই। আর এজন্যই একজন বা প্রতিষ্ঠানের সবার চাকরি থাকল কি থাকল না, তা নিয়ে চিন্তার কোনো অবকাশ আমাদের গণমাধ্যমগুলোর নেই।

আর্থিক অনিরাপত্তা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের উপরিউক্ত গবেষণাটিতেই সাংবাদিকদের আর্থিক অনিরাপত্তার দিকটি উঠে এসেছে। এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ৩১ শতাংশ সাংবাদিক মনে করেন যে তারা যে বেতনভাতা পান, তা দিয়ে জীবন কাটানো বেশ কঠিন। একই সংখ্যার সংবাদকর্মী মনে করেন, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের বেতনভাতা অনেক কম।

আমাদের দেশে সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যখন গণমাধ্যমে কাজ করতে আসেন, তখন তিনি ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা বেতনভাতা পান (ব্যতিক্রম থাকতে পারে)। বর্তমান সময়ে ঢাকা শহরের মতো এলাকায় এ টাকায় পুরো মাস কখনো চলা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে থাকা প্রতিনিধি ও সংবাদকর্মীদের বেতনভাতার কথা না-ই বা বললাম। আর এ কারণেই ঢাকার বাইরের সাংবাদিক একাধিক হাউসের হয়ে কাজ করতে বাধ্য হন, অনেক সময় অবলম্বন করেন অনৈতিক ও অবৈধ পন্থা। এসব সমস্যার কথা বলে সাংবাদিকদের এসব অনৈতিক বা অবৈধ কর্মকাণ্ডকে বৈধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে না কোনোভাবেই, বরং মুদ্রার অপর পিঠটা দেখানো হচ্ছে মাত্র।

দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জন করেও বাংলাদেশের নবীন সংবাদকর্মী যে বেতনভাতা পান, অনেক 'অড জবস' করেও তার চেয়ে বেশি মাসিক আয় সম্ভব হয় এদেশেই। ফলে দক্ষ সংবাদকর্মী দেশের গণমাধ্যমে কাজ করতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছেন। এছাড়া অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বেতনভাতাও দেওয়া হয় না, সংবাদকর্মীদের জীবন থাকে আর্থিক অনিশ্চয়তায় ঘেরা। মাসের পর মাস বেতনভাতা না পেয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হন তারা। ফলে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো তথা পুরো দেশ।

পেশাগত অনিরাপত্তা

আমার মনে হয়, সাংবাদিকদের পেশাগত অনিরাপত্তা নিয়েই আলোচনা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। আমরা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বলতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টিকেই বুঝে থাকি। আমাদের রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থাও পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা বিধানের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। তারপরও কি আমাদের সংবাদকর্মীরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছেন? বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই এ বিষয়টি একটি ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নেদারল্যান্ডসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফ্রি প্রেস আনলিমিটেডের পরিচালক লিও উইলেমস বলেছেন,

> গড়ে প্রতি পাঁচ দিনে একজন সাংবাদিক পৃথিবীর কোথাও না কোথাও শুধু সাংবাদিক হওয়ার জন্য খুন হচ্ছেন। ১০টি

> ঘটনার মধ্যে ৯টিরই বিচার হয় না। এতে যে বিচারহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়, তা কেবল মৃত্যুর হুমকি ও সহিংসতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সাংবাদিকদের কারান্তরীণ করার হার এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কাজের সময় সাংবাদিকদের নিয়মিতভাবে হয়রানি ও ভয় দেখানো হয়। আজ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সাংবাদিকতা বিপজ্জনক পেশার অন্যতম। (মানবকণ্ঠ, ২০১৮)

এছাড়া নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের ২০১৮ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়,

> বিশ্বজুড়ে চলতি বছর সাংবাদিক খুনের হার বেড়েছে। যুদ্ধ ও সংঘাতের ঝুঁকি কমে আসা সত্ত্বেও ২০১৮ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা আরো বেশি হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে ... এক বছর আগের তুলনায় ২০১৮ সালে প্রায় দ্বিগুণ সাংবাদিক পেশাগত কারণে প্রতিশোধমূলক হত্যার শিকার হয়েছে। (ইত্তেফাক, ২০১৮)

প্যারিসভিত্তিক সংস্থা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী ৮০ জন ব্লগার, সিটিজেন জার্নালিস্ট ও গণমাধ্যমকর্মী খুন হয়েছেন।

ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক জামাল খাশোগি ইস্যুতেও কম আলোচনা হয়নি। রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় কীভাবে একজন সাংবাদিকের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ড। মিয়ানমারে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময় সরকারের রোষানলে পড়া রয়টার্সের দুই সাংবাদিক ওয়া লোন ও কিয়াও সোয়েওর বিচার কার্যক্রম নিয়েও আমরা অবগত আছি।

আমাদের দেশেও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ফলে বিভিন্ন সময় সংবাদকর্মীরা হামলা-হয়রানি এমনকি হত্যার শিকার হয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা রাখায় অন্তত ১৩ জন সাংবাদিককে শহিদ হতে হয়েছে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার দোসরদের হাতে। স্বাধীন বাংলাদেশেও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ফলে বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের হত্যা করা হয়েছে। আন্দোলনের নামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাংবাদিকদের ওপর হামলা করা হয়েছে বিভিন্ন সময়।

চিহ্নিত সমস্যার সমাধান কোথায়?

যেসব অনিরাপত্তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তা কমবেশি দেশের সাংবাদিক মহলের জানা। অর্থাৎ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে যেসব অন্তরায় রয়েছে, তা চিহ্নিত অবস্থায়ই রয়েছে। এখন প্রয়োজন সমাধান। সাংবাদিক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফ্রি প্রেস আনলিমিটেডের পরিচালক লিও উইলেমস সমাধান হিসেবে প্রকাশ্যে আলোচনার কথা বলেছেন (মানবকণ্ঠ, ২০১৮)। এ বিষয়ে আমিও একমত পোষণ করি। আমাদের সাংবাদিকদের ভেতর চাকরির ও আর্থিক যে অনিরাপত্তা সর্বদা বিদ্যমান, তা নিয়ে আলোচনা থাকলেও তা ফলপ্রসূ নয়। একই পর্যায়ে থাকা দুই বা ততোধিক সংবাদকর্মীর ভেতর এসব অনিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় কোনো সমাধান আসার সম্ভাবনা নেই। বরং এই আলোচনাগুলো গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে অবস্থার ইতিবাচক উত্তরণ সম্ভব। সরকারের উদ্যোগেই সাংবাদিকদের অষ্টম ওয়েজ বোর্ড কার্যকর হয়েছিল। তবে দেশের সব সংবাদপত্র এই ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী বেতনভাতা প্রদান করেনি। এ বিষয়ে সরকারের স্পষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও'তে কর্মরত সাংবাদিকদের বেতনভাতার বিষয়ে কোনো নীতিমালা নেই। যাকে যত কম বেতনভাতা দিয়ে নিয়োগ দেওয়া যায়, তা-ই দেওয়া হচ্ছে। ফলে এ খাতে একধরনের অরাজকতা রয়েছে। এ অবস্থার উত্তরণেও সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আইন করে সাংবাদিকদের চাকরিজনিত ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হলেও পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় তাঁদের যে অনিরাপত্তা সৃষ্টি হয়, তা থেকে উত্তরণে আসলে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিশ্বব্যাপী সংবাদকর্মীর পেশাটিকে অনেক দেশের সরকারই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করে। শুধু সরকার নয় বরং রাজনৈতিক দলগুলোও নানা কারণে গণমাধ্যমকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে তাদের বিভিন্ন আন্দোলনে সংবাদকর্মীরা রোষানলে পড়েন। এক্ষেত্রে আমাদের অডিয়েন্স এবং সাধারণ মানুষকে এ নৈতিক শিক্ষাটি প্রদান করতে হবে যে, আর সব পেশার মতো সাংবাদিকতাও একটি পেশা, যেখানে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সংবাদকর্মী তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন মাত্র। মুদ্রার অপর পিঠ হিসেবে সংবাদকর্মীদেরও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে এই কারণে যে, যেন তাদের কোনো অনৈতিক পন্থা অবলম্বনের ফলে দেশের সামগ্রিক সাংবাদিক মহলের প্রতি সাধারণ মানুষের নেতিবাচক ধারণা তৈরি না হয়।

দিনশেষে সাংবাদিক নিরাপত্তার বিষয়টি আসলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সাংবাদিকতা বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ পেশাগুলোর অন্যতম। বিশ্বের কোনো দেশের সরকার নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবে না যে, তার দেশে সাংবাদিক শতভাগ নিরাপদ। এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এ বাস্তবতায় থেকেই যতটা সম্ভব সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকদের চাকরিজনিত, আর্থিক ও পেশাগত নিরাপত্তা বিধান করতে পারলেই দেশের গণমাধ্যম খাতটি এগিয়ে যাবে, ফল হিসেবে লাভবান হবে বাংলাদেশ, প্রিয় মাতৃভূমি।

লেখক: শিক্ষক, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাংবাদিকের ডিজিটাল নিরাপত্তা

আমীন আল রশীদ

বলা হয়, এই ইন্টারনেট সময়ে একজন মানুষের হাতে একটি স্মার্টফোন এবং সেখানে একটি ইন্টারনেট কানেকশন থাকা মানেই তিনি একজন ব্রডকাস্টার বা সম্প্রচারকারী। অর্থাৎ আপনার চোখের সামনে যা কিছু ঘটছে, তা মুহূর্তেই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ জানতে পারছেন যদি আপনি তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনার ছবি তুলে বা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।

মূলধারার গণমাধ্যমও ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই সেই ছবি সারা বিশ্বের মানুষ দেখে ফেলতে পারে– যার সবশেষ বড়ো উদাহরণ নিউজিল্যান্ডের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা। হামলাকারী নিজেই তার মাথায় হেলমেট এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে ক্যামেরা যুক্ত করে গুলি করতে করতে মসজিদে ঢুকছে, সেই ছবি প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়াতেই ছড়িয়ে পড়ে।

সিলেটের শিশু রাজনকে পিটিয়ে হত্যা কিংবা কলেজছাত্রী খাদিজাকে নৃশংসভাবে কোপানোর মতো ভয়াবহ দৃশ্যগুলো কোনো পেশাদার সাংবাদিকের ক্যামেরায় তোলা নয়। সেগুলো ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোনো সাধারণ মানুষের ক্যামেরায় তোলা এবং মূলধারার গণমাধ্যমে আসার আগেই ছবিগুলো ফেসবুকে ভাইরাল হয়। যে কারণে এখন একদিকে সবাই যেমন ব্রডকাস্টার বা সম্প্রচারকারী, তেমনি তথ্যপ্রযুক্তির এ সুযোগ নিয়ে এর ভয়াবহ অপব্যবহার, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, ব্যক্তিগত আক্রমণের ঘটনাও বাড়ছে। মূলধারার সাংবাদিকও এ বিপদ থেকে মুক্ত নন।

বাস্তবতা হলো, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা নিয়ে সাংবাদিকরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও বা এসব আইনে ... নিরাপত্তা। অর্থাৎ আমরা যে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করি, সেগুলোই বা কতটুকু সুরক্ষিত?

বাস্তবতা হলো, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা নিয়ে সাংবাদিকরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও বা এসব আইনে অনেক নিরীহ সাংবাদিক শিকার হলেও যে বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যায়, তা হলো ডিজিটাল ডিভাইসের নিরাপত্তা। অর্থাৎ আমরা যে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করি, সেগুলোই বা কতটুকু সুরক্ষিত?

আমরা যে যন্ত্রগুলো ব্যবহার করি, সেগুলো কীভাবে চলে অর্থাৎ তার টুলগুলো কি আমরা জানি? আমরা যখন মোবাইল ফোনে কথা বলি, তখন এটি ফোনের অপরপ্রান্তে আরেকজনের ফোনে সংযুক্ত হওয়ার আগে অন্তত একটি জায়গায় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির আর্কাইভ অতিক্রম করে। ফলে

সেখানে সব তথ্যই সংরক্ষিত থাকে। আবার সব কোম্পানির নিকটস্থ টাওয়ার থেকে গ্রাহকরা সবসময়ই নজরদারির ভেতরে থাকে। চাইলে এই ফোন কলগুলো তৃতীয় কেউ রেকর্ডও করতে পারে। প্রত্যেক মোবাইল ফোনের নিকটস্থ টাওয়ার থেকে ব্যবহারকারীরা নজরদারির ভেতরে থাকেন।

ফলে এ আশঙ্কাও আমাদের মনে থাকে যে, আমাদের ফোন কল কি রেকর্ড হচ্ছে? এসএমএস কি অন্য কেউ পড়ছে? ফেসবুক মেসেঞ্জারে আমরা যেসব তথ্য ও ছবি আদানপ্রদান করছি, তা কি তৃতীয় কেউ পড়ছে বা দেখছে? এসব উদ্বেগ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কিংবা ৫৭ ধারার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও ডিজিটাল ডিভাইসের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের ভাবনাটা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ঝুঁকিও বাড়ছে। বিশেষ করে সাংবাদিকদের ঝুঁকি অনেক বেশি। কেননা তাদের অনেক স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করতে হয়। ফলে অনেক সময় তারা বিভিন্ন বাহিনীর নজরদারিতেও থাকেন। সেক্ষেত্রে তাদের ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

২.

ইন্টারনেট ও মোবাইল অ্যাপসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফেসবুক, গুগল, ইউটিউব, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার ইত্যাদিতে তথ্য আদানপ্রদানের পরিমাণ বাড়ছে এবং সংগত কারণেই এসব মাধ্যমে ঝুঁকিও বেড়েছে। বিশেষ করে সাংবাদিকদের এসব ঝুঁকির বিষয়ে এখন অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। মোবাইল ফোনে কথা বলা এবং এসএমএস আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হয়। সাংবাদিক তার গোপন সূত্রের সঙ্গে কীভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং একই সঙ্গে তার সোর্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তথ্য সংগ্রহ করবেন, সেই কৌশল নিয়েও এখন আমাদের কথাবার্তা বলা উচিত।

তবে শুধু বাইরে নয়, কর্মক্ষেত্রেও সাংবাদিককে তার ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে সতর্ক থাকা দরকার। কেননা সব অফিসেই এখন সিসি ক্যামেরা থাকে। ফলে কেউ যখন নিজের মোবাইল ফোন বা পিসিতে পাসওয়ার্ড টাইপ করেন, তখন সেটি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে কেউ, বিশেষ করে আইটির লোকজন দেখতে পারেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে সব অফিসের নীতি বা পলিসি এক নয়। তবে সম্ভবত কোনো প্রতিষ্ঠানই তার সহকর্মীদের ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড হ্যাক করা বা জানার চেষ্টা করে না। তবে সব সহকর্মীর মানসিকতা যেহেতু এক নয়, সে কারণে অফিসের টেবিলে নিজের মোবাইল ফোন আনলক করে ফেলে রেখে না যাওয়া, কম্পিউটারে কাজ শেষে সেটি লগআউট করা, অফিসের কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করলে সেখানে রিমেম্বার পাসওয়ার্ড অপশন চালু না রাখা এবং প্রতিবার ব্যবহারের সময় লগ ইন ও লগ আউট করার মতো ছোটো ছোটো সাবধানতা বিপত্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারে। অনেক সময় ঘাড়ের পেছনেই আপনার কোনো দুষ্টু সহকর্মী থাকতে পারেন। ফলে পাসওয়ার্ড দেওয়া এবং গোপনীয় কিছু লেখার আগে ভালো করে খেয়াল করুন ঘাড়ের পেছনে কেউ আছেন কি না।

৩.

ইন্টারনেটে নানা ধরনের অফার ও সুযোগের প্রলোভনে পা দিয়ে আমরা বুঝে না বুঝে অসতর্কভাবে অনেক জায়গায় নিবন্ধন করি। সেখানে নিজের ইমেইল তো বটেই, অনেক সময় ফোন নম্বরও দিতে হয়। এটি সবসময় সুখকর না-ও হতে পারে। মনে রাখা দরকার, ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি বা অপব্যবহারের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হতে গিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যগুলো তাদের দিয়ে দিচ্ছি এবং সেই তথ্য কে কখন কোথায় কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে, তা আমরা জানি না। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত নিবন্ধনের নামে মানুষের তথ্যভাণ্ডার বা ডাটাবেজ গড়ে তোলে এবং সেই তথ্য বিক্রি করে। এমনকি এসব তথ্য জঙ্গি কর্মকাণ্ডে ব্যবহারও অসম্ভব নয়। সুতরাং ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার যেমন জরুরি, তেমনি এটির ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকা আরও জরুরি। সব সময় সবখানে নিবন্ধিত হওয়ার নামে ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে দেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মোবাইল ফোনে বিভিন্ন অ্যাপ ইনস্টলের মধ্যে ভেরিফিকেশন চাওয়া হয়, ভেরিফিকেশন কোড দেওয়া হয়– এসবও কোথাও না কোথাও সংরক্ষিত থাকে এবং কে কখন এটি কী কাজে লাগাবেন বোঝা মুশকিল। বলা হয়, প্রয়োজনের বাইরে প্রযুক্তির অতি ব্যবহারও মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

আমরা ব্যক্তিগত ও তথ্যের নিরাপত্তার জন্য নানারকম সুরক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি। যেমন, এমন কোনো অ্যাপ যা দিয়ে কথা বললে বা তথ্য আদানপ্রদান করলে সেটি তৃতীয় কেউ নজরদারি করতে পারে না। কিন্তু এই সিকিউরিটি মেজার বা সুরক্ষা পদ্ধতি একদিকের হলে লাভ নেই। বরং যে দু'জন তথ্যের আদানপ্রদান করছেন তার কোনো একজনের সুরক্ষা পদ্ধতি দুর্বল হলে তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। যেমন আপনি জিমেইল বা ইয়াহুর চেয়ে প্রোটোন মেইলকে অধিকতর নিরাপদ ভেবে কাউকে প্রোটোন মেইল দিয়ে তথ্য পাঠালেন। কিন্তু যাকে পাঠালেন তিনি প্রোটোন মেইল ব্যবহার করেন না। সুতরাং এই একপাক্ষিক সতর্কতার কোনো মূল্য নেই। চ্যাটিংয়ের জন্য মোবাইল অ্যাপ 'সিগন্যাল'কে তুলনামূলকভাবে বেশি নিরাপদ মনে করা হয়। কিন্তু যে দুজন ব্যক্তি সিগন্যালে কথাবার্তা বলছেন, তাদের মধ্যে কেউ একজনের অসতর্কতায় অন্যজন বিপদে পড়তে পারেন। অর্থাৎ ইন্টারনেটে যোগাযোগ সুরক্ষায় দুই প্রান্তের ব্যক্তিকেই সমান সতর্ক থাকতে হয়। ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইমেইলে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড দেওয়া এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলোতেও শক্তিশালী পাসওয়ার্ড দেওয়ার ওপরে গুরুত্বারোপ করা হয়। বলা হয়, এখন কয়েকটি বর্ণে বা শব্দে পাসওয়ার্ড দেওয়ার চেয়ে কোনো একটি ফ্রেজ অনেক বেশি শক্তিশালী। যেমন একটা সময় পর্যন্ত ১২৩ এরকম পাসওয়ার্ড ব্যবহারের প্রবণতা ছিল। অনেকে নিজের নামের প্রথম বা শেষাংশ, নিজের সন্তানের নাম, পছন্দের খাবার বা স্থান ইত্যাদি পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, এটি যথেষ্ট নয়। বরং এখন শক্তিশালী পাসওয়ার্ড হতে পারে কোনো একটি ফ্রেজ, যেটি আপনি সহজে মনে রাখতে পারেন। কিন্তু তৃতীয় কেউ কখনো ধারণাই করতে পারবে না যে, আপনি এরকম পাসওয়ার্ড দিয়েছেন। ফলে সেটি সহজে হ্যাক করাও যাবে না। যেমন কোনো একটি কবিতার লাইন অথবা লম্বা একটি বাক্য যেটি আপনি সহজেই মনে রাখতে পারেন।

৪.

বিভিন্ন কল রেকর্ডিং অ্যাপ আছে যেগুলো ইনস্টল করতে গেলে ফোনের গ্যালারি, ক্যামেরাসহ নানা বিষয়ে একসেস চায়। অথচ রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তার মানে, আপনি ওই অ্যাপটি ইনস্টল করা মানে হলো, আপনার ফোনের যাবতীয় ছবির মালিকানা আরেকজনের হাতে তুলে দিলেন। ফলে ইনস্টল করার আগে ভালো করে পড়ে নিন কোন কোন বিষয়ে তারা একসেস চাচ্ছে। আপনাকে একটি সেবা দিয়ে তারা আপনার কাছ থেকে কী কী নিয়ে নিচ্ছে, আপনার ব্যক্তিগত যাবতীয় গোপনীয়তায় অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছেন কি না, সেটি আগে নিশ্চিত হোন।

মনে রাখা দরকার, এ দুনিয়ায় কোনো কিছুই ফ্রি নয়। ফলে তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় আপনাকে কেউই বিনা পয়সায় বা বিনা স্বার্থে কিছু দেবে না। সুতরাং যে কোনো কিছু গ্রহণের আগে ভালো করে যাচাই করে দেখা প্রয়োজন যে, কীসের বিনিময়ে আপনি কী নিচ্ছেন। তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় মানুষের জীবনযাত্রা একদিকে যেমন সহজ হচ্ছে, তেমনি এই সহজ হওয়ার সুবিধা নিতে গিয়ে মানুষ নানাবিধ জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়ছে তার অজান্তেই। সে টেরই পাচ্ছে না তার যাবতীয় তথ্য সে কখন কীভাবে কার হাতে তুলে দিল। সবাই আপনার তথ্য নিয়ে ব্যবসা না-ও করতে পারে। সবসময় আপনি তথ্যসন্ত্রাসের শিকার না-ও হতে পারেন। কিন্তু কখনোই ভিকটিম হবেন না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে বলা হয়, মোবাইল ফোনে যতটা সম্ভব কম অ্যাপ ইনস্টল করা উচিত। একেবারে যেসব অ্যাপ আপনার না হলেই নয়, কেবল সেগুলোই ইনস্টল করুন এবং ইনস্টল করার আগে ভালো করে পড়ে দেখুন তারা আপনার কাছে অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছুর একসেস চায় কি না।

আপনি কোনো রাইড শেয়ারিংয়ের অ্যাপ যেমন পাঠাও, উবার ইত্যাদি ইনস্টল করবেন। ফলে তারা বড়োজোর আপনার লোকেশনের একসেস চাইতে পারে। কিন্তু তারা যদি আপনার এসএমএস, ক্যামেরা বা গ্যালারির একসেস চায়, সেটি কেন দেবেন? অর্থাৎ আপনি যে কাজের জন্য অ্যাপটি নামাচ্ছেন, সেই কাজ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে অন্য কোনো কিছুরই প্রবেশাধিকার বা একসেস চাওয়ার অধিকার কারও নেই। সুতরাং প্রতিটি বাটনে ক্লিক করার আগে নিজে সতর্ক হোন যে, কোথায় ক্লিক করছেন, কেন করছেন। আপনার একটি ক্লিকের বিনিময়ে ফোনের যাবতীয় তথ্য কোনো দুষ্টু লোকের হাতে চলে যেতে এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না। সুতরাং তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে জীবনযাত্রা সহজ করার নামে আমরা নিজেদের জন্য বড়ো বড়ো গর্ত তৈরি করে ফেলছি কি না, সে বিষয়ে সচেতন থাকার কোনো বিকল্প নেই।

মনে রাখা দরকার, মোবাইল ফোন বা তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া এই সময়ে এসে আপনার বেঁচে থাকা হয়তো কঠিন; কিন্তু আপনি যে ডিভাইসটি ব্যবহার করছেন এবং সেই ডিভাইসে যেসব অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করছেন, সেগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা, বিশেষ করে তার সুরক্ষার বিষয়গুলো জেনে নেওয়া খুবই জরুরি।

৫.
ডিজিটাল ডিভাইসের এসব সুরক্ষার পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারেও সতর্ক থাকা, বিশেষ করে অন্যের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। ফেসবুকে যেহেতু কোনো সম্পাদক নেই, গণমাধ্যমের মতো এখানে কোনো গেটকিপার নেই, তাই ফেসবুক ব্যবহারকারী নিজেই তার নিজের সম্পাদক। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'মার্জিনে মন্তব্য: গল্পের কলকব্জা'য় লিখেছেন: 'আপনি কী লিখবেন, সেটি যেমন জরুরি, তেমনি কী লিখবেন না সেটি আরও জরুরি।' ফেসবুকে মন চাইলেই যা ইচ্ছে তা-ই লেখা বা কারও চরিত্র হনন কিংবা ব্যক্তিগত আক্রমণ চলতে থাকলে এসব প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিতর্কিত ৫৭ ধারার যৌক্তিকতা জোরালো হয়। বিশেষ করে সাংবাদিকদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস যেহেতু অনেক বেশি, তাই একজন গণমাধ্যমকর্মী চাইলেই যা খুশি লিখতে পারেন না।

সরকারও নাগরিকের সাইবার নিরাপত্তা ইস্যুতে আন্তরিক। যদিও অনেক সময় আইনের কড়াকড়ি ও অপব্যবহারও হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা: হালচিত্র- ২০১৮'তেও পরিষ্কার বলা হয়েছে, ইন্টারনেট এবং সাইবার নিরাপত্তার ওপর জোর দিতে হবে। ইন্টারনেট যেমন আইসিটি ব্যবহারকে উন্নত করে, তেমনই এর অবৈধ ব্যবহার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন জরুরি। নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ও ডাটা যাতে কেউ অবৈধ কিংবা অন্য খাতে ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন, নীতি, সার্কুলার ইত্যাদি প্রণয়ন ও সংশোধন করা যেতে পারে। আইনের কারণে যাতে আইসিটি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশে সংযোগ বা কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, বিশেষ করে টেলিডেনসিটি ১০ শতাংশ বাড়লে জিডিপি বৃদ্ধি পায় ০.৬০ শতাংশ। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ছিল ৩০ শতাংশের মতো। পরবর্তী সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নানা উদ্যোগের ফলে এই হার ৯১ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০২০ সালের মধ্যে এ হার একশ'তে উন্নীত করতে চায় সরকার (ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা: হালচিত্র- ২০১৮, পৃষ্ঠা ২)।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত বিশ্বের ৭৪৩ কোটি মানুষের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে ৩৪২ কোটির বেশি, অর্থাৎ ৪৬.১ শতাংশ মানুষ। পরবর্তী তিন বছরে এ সংখ্যা যে আরও অনেক বেড়েছে তাতে সন্দেহ কম। শুধু মোবাইল ইন্টারনেটের সম্প্রসারণই নয়, বরং ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ব্রডব্যান্ড কানেকশন ৫০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে আইটি/আইসিটি শিল্প ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার সৃষ্টি করেছে। ফলে সব মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাত একটি বড়ো ধরনের পরিবর্তন ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা বস্তুত নানা ঝুঁকিও তৈরি করছে। অনেক অসাধু ব্যক্তি ও চক্র এই খাতে ঢুকে পড়ে ব্যক্তির গোপনীয়তায় হানা দিয়ে নানাভাবে মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করছে। সুতরাং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এর সেফটি-সিকিউরিটি অর্থাৎ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়েও প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। গণমাধ্যমকর্মীদের তো বটেই।

লেখক: চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম গবেষক

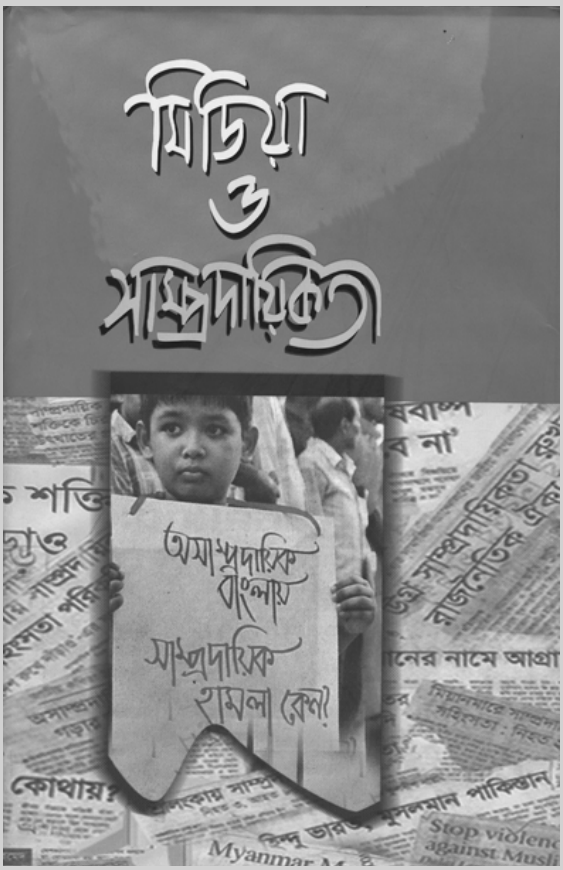

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সময়ের দাবি

মামুন অর রশিদ

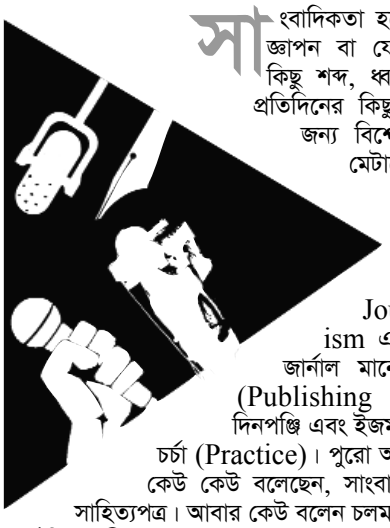

সাংবাদিকতা হচ্ছে তথ্য। সাংবাদিকতা হচ্ছে জ্ঞাপন বা যোগাযোগ সাধন। সংবাদিকতা কিছু শব্দ, ধ্বনি বা চিত্রের রূপে রূপায়িত প্রতিদিনের কিছু ঘটনাবলি। নতুনকে জানার জন্য বিশ্বের মানুষের অদম্য কৌতূহল মেটানোর লক্ষ্যে জ্ঞাপন পদ্ধতির নাম সাংবাদিকতা। ইংরেজি 'জার্নালিজম' (Journalism) শব্দ থেকে সাংবাদিকতা কথাটি এসেছে। Journalism হলো Journal ও ism এই দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। জার্নাল মানে কোনো কিছু প্রকাশ করা (Publishing something)। অন্য অর্থে দিনপঞ্জি এবং ইজম মানে অভ্যাস বা অনুশীলন বা চর্চা (Practice)। পুরো অর্থে দিনপঞ্জি অনুশীলন।

কেউ কেউ বলেছেন, সাংবাদিকতা হচ্ছে সাততাড়াতাড়ির সাহিত্যপত্র। আবার কেউ বলেন চলমান ইতিহাস। সাংবাদিকতা এক নৈর্ব্যক্তিক জীবনপ্রবাহের খণ্ডাংশমাত্র, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের মধ্যেই যার সীমানা বিস্তৃত। উইকহ্যামস্টিডের মতে, সাংবাদিকতা হচ্ছে সমাজসেবার প্রধান একটি আধুনিকরূপ।

আর সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত লোকজনই সাংবাদিক নামে পরিচিত। অর্থাৎ যিনি সংবাদের সেবা করে থাকেন, তিনিই সাংবাদিক। আরেক অর্থে যিনি সংবাদ লেখক, তিনিই সাংবাদিক। আধুনিক সাংবাকিতায় একজন পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক হচ্ছেন তিনি, যিনি রিপোর্টিং এডিটিংসহ সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব শাখাতেই সমান পারদর্শী। আরডি ব্লুমনফেল্ড বলেন, যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ এবং তাকে সংবাদ উপযোগী করে প্রকাশ করেন তিনিই সাংবাদিক।

অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে, যিনি সংবাদ লেখা ও সম্পাদনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই সাংবাদিক।

একজন পেশাদার সাংবাদিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবাদপত্র আইনে বলা হয়েছে, পেশাদার সাংবাদিক হচ্ছেন একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক, যিনি একটি সংবাদপত্র বা এতদসংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত– যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সম্পাদক, প্রতিবেদক, সাংবাদদাতা, অনুলিপি পরীক্ষক (কপি টেস্টার),কার্টুনিস্ট, সংবাদ আলোকচিত্রী, ক্যালিগ্রাফিস্ট ও প্রুফ রিডার (সংবাদ সংশোধক)।

সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সংগঠনের তথ্যমতে, বিশ্বে সাংবাদিকতায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ... ফ্রিডম নেটওয়ার্ক রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী, যেসব দেশে পেশাগত কারণে সাংবাদিকরা ঝুঁকিতে আছেন, সেগুলোর মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম

সুতরাং একজন পেশাদার সাংবাদিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি গণমাধ্যমের (সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন নিউজপোর্টাল) কোনো না কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে থেকে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

আর অন্য পাঁচটি পেশার চেয়ে সাংবাদিকতা পেশা আলাদা। এটিকে মহৎ পেশাও বলা যায়। যাদের কাজ মানুষের দৈনন্দিন তথ্যচাহিদা মেটানো। সত্যকে তুলে মানুষের সামনে নিয়ে আসা নিজের জীবন বাজি রেখেও। বর্তমানে বিশ্বে সাংবাদিকতা পেশায় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এখন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা যখন হুমকির মুখে পড়ে, তখন মূলত তথ্যের অবাধ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। তাঁদের পেশাগত নিরাপত্তার বিষয়টি তাই বিশ্বে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

সম্প্রতি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) অর্থায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী দেশের 'পেশাদার সাংবাদিকরা চাকরি নিয়ে কতটুকু সন্তুষ্ট' (২০১৮) বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১৫টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র যার ৯টি বাংলা ও ৬টি ইংরেজি এবং ২১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, দুটি বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, ৪টি অনলাইন সংবাদ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩৩৪ জন সাংবাদিকের তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার নেন। তার গবেষণায় দেখা যায়, ৩৩৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩০৭ জন অর্থাৎ ৯২ শতাংশ মনে করে, সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। তাঁরা জানান, যে কোনো সময় চাকরি চলে যেতে পারে আর চাকরি চলে গেলে অভিযোগ করার মতো সুযোগ নেই। টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের মধ্যে এ নেতিবাচক ধারণা সবচেয়ে বেশি।

গবেষণায় দেখা যায়, ২৭ শতাংশ সাংবাদিক জানিয়েছেন, তাঁরা চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট, ২৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ অসন্তুষ্ট, ৪৮ দশমিক ২০ শতাংশ কিছুটা সন্তুষ্ট। ৭২ শতাংশের বেশি সাংবাদিক অসন্তুষ্ট। তবে বিভিন্নভাবে তাদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ফল পাওয়া যায়। কর্মস্থলে নারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টির বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৮ ভাগ কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আর ৭ শতাংশ নারী সাংবাদিক যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

কর্মপরিবেশ নিয়ে সন্তোষজনক মত দেন ৩৬ শতাংশ। তা উপযোগী বলেছেন ২৬ শতাংশ সাংবাদিক। অসন্তোষ বলে মত দিয়েছেন ১৩ শতাংশ সাংবাদিক। গণমাধ্যমে সাংবাদিকদের কর্মচাপ সম্পর্কে প্রায় ৫৭ শতাংশ মনে করেন, তাঁরা অতিরিক্ত কাজ করেন এবং এই প্রবণতা দেখা যায় বাংলা সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলে। আবার ৬৫ শতাংশ সাংবাদিক মনে করেন, তাঁদের সুনির্দিষ্ট কর্মচাপ আছে। ৫৪ শতাংশ সাংবাদিক নিজের ইচ্ছে কিংবা পছন্দে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর সাংবাদিকতাকে একটি মর্যাদাকর পেশা ভেবে যোগদান করেন ৩২ শতাংশ। ৭৩ শতাংশ জানিয়েছেন, পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক নিয়োগ হয়। ৩১ ভাগ সাংবাদিক মনে করেন, তাঁরা যে বেতন পান, তা দিয়ে ব্যয়নির্বাহ কঠিন এবং সমসংখ্যক মনে করেন, তাদের যোগ্যতার তুলনায় বেতন কম। ৫৭ ভাগ সাংবাদিক ওয়েজ বোর্ড অনুসরণ করার কথা বলেন।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিজমের (আইএফজে) এশিয়া প্যাসিফিক শাখার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে– বিচারহীনতা, সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনাগুলো বাংলাদেশে গণমাধ্যমে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আইএফজে বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশে এক বছরে সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে, যা ৩ মে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়। এতে দুজন সাংবাদিক হত্যা এবং কমপক্ষে ১৬ জন সাংবাদিকের ওপর হামলার তথ্য রয়েছে।

বৈশ্বিক পরিস্থিতি

সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সংগঠনের তথ্যমতে, বিশ্বে সাংবাদিকতায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বছর হিসেবে ২০১৮ সালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংগঠনগুলোর মতে, ২০১৮ সালে নজিরবিহীন সাংবাদিক নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। ফ্রিডম নেটওয়ার্ক রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী, যেসব দেশে পেশাগত কারণে সাংবাদিকরা ঝুঁকিতে আছেন, সেগুলোর মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম। দেশটিতে অপহরণ ও প্রাণ হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন সাংবাদিকরা। পাঁচ বছরে দেশটিতে কমপক্ষে ২৬ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

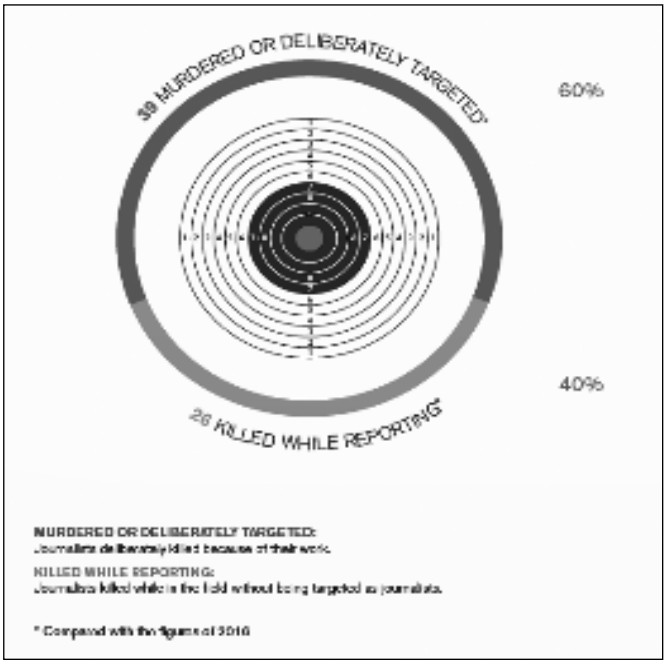

চিত্র: সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের ধরন

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালে বিশ্বে কমপক্ষে ৫৩ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নিহত হয়েছেন ১৯ জন। কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ জানিয়েছে, ২০১৭-'১৮ সালে বিশ্বজুড়ে ২৭২জন সাংবাদিককে জেলে ঢোকানো হয়েছে।

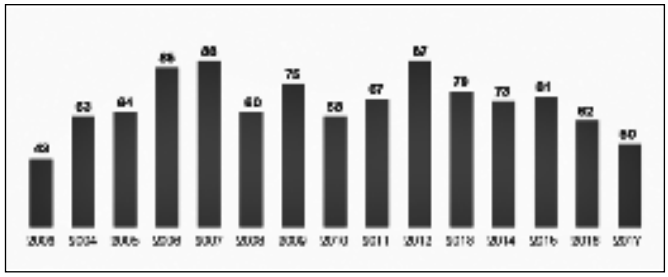

চিত্র: ১৫ বছরে বিশ্বব্যাপী ১,০৩৫ জন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন

সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের (আরএসএফ) হিসাবে ২০১৮ সালে প্রায় ৮০ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, কারাদণ্ড ও জিম্মি করা হয়েছে অনেককে। তাদের প্রকাশিত রিপোর্ট

বলছে, যে ৮০ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের অর্ধেকেরও বেশি জনকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৭ সালের তুলনায় সাংবাদিক হত্যা বেড়েছে অন্তত ১৫ শতাংশ। এর বাইরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৩৪৮ জন সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ৬০ জন জিম্মি হয়েছেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাতে।

এ ছাড়াও রিপোর্টে উঠে এসেছে ইস্তানবুলে সৌদি দূতাবাসে কলামিস্ট জামাল খাশোগির হত্যা কিংবা শ্লোভাকিয়ার ডেটা জার্নালিস্ট ইয়ান কুৎসিয়াকের তাঁর বাগদত্তাসহ নিহত হওয়ার ঘটনাগুলো। সাংবাদিকতায় সবচেয়ে বেশি খারাপ পরিস্থিতি আফগানিস্তানে বলে উল্লেখ করেছে আরএসএফ। এ বছর দেশটিতে ১৫ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এর পরেই রয়েছে সিরিয়া। সেখানে নিহত হয়েছেন ১১ জন।

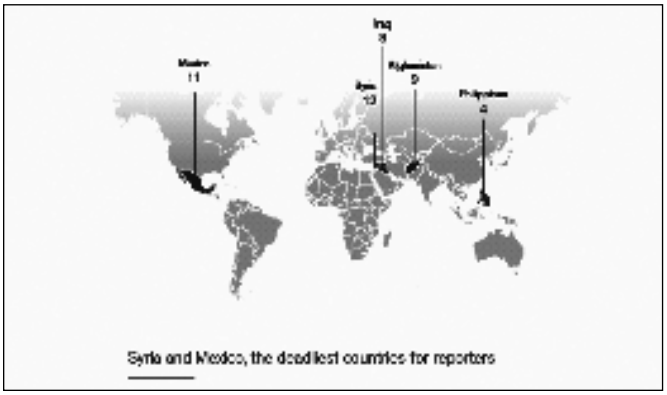

চিত্র: বিশ্বে সাংবাদিকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশ

সংঘাতপূর্ণ দেশ নয়; কিন্তু সাংবাদিক হত্যা করা হয়েছে– এমন দেশগুলোর মধ্যে ওপরে রয়েছে মেক্সিকো। ৯ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে সেখানে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে গত জুনে ক্যাপিটাল গ্যাজেট নিউজপেপারের ৫ জন গুলিতে নিহত হন।

সংগঠনটির মহাসচিব ক্রিস্টোফ ডেলোয়ারের মতে, 'পরিস্থিতি খুবই সঙ্গিন। বিবেকহীন রাজনীতিক, ধর্মীয় নেতা ও ব্যবসায়ীরা প্রায়ই এখন খোলাখুলিভাবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ান। এ কারণেই সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতার মাত্রা বেড়েছে।'

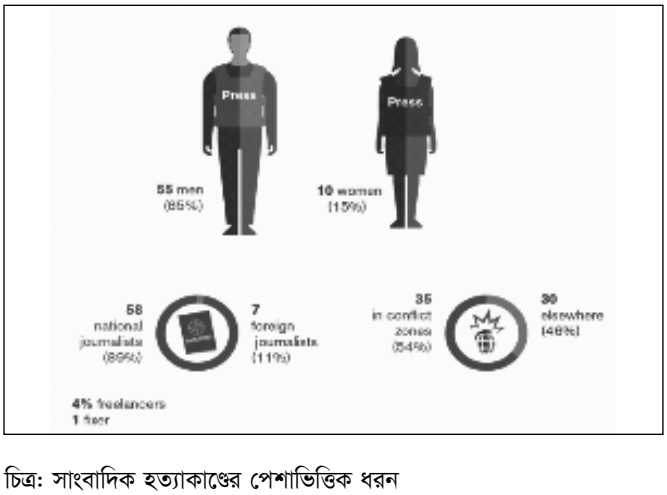

চিত্র: সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের পেশাভিত্তিক ধরন

বিশ্বব্যাপী কতজন সাংবাদিক, কবি এবং লেখক কারাবন্দি বা নিখোঁজ, তার সঠিক হিসাব কারও জানা নেই। এমনকি লেখকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'পেন'-এর কাছে মামলার যে তালিকা রয়েছে, সেটাও পূর্ণাঙ্গ নয়।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে, তবে সাংবাদিক ও মতপ্রকাশের ওপর উপর্যুপরি আঘাতের কারণে সাংবাদিকরা 'সেলফ সেন্সরশিপ' আরোপ করেছেন। সাংবাদিকদের ওপর আঘাত বা আক্রমণের বিচার না হওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের হাতে চারজন খুন, দুজন অপহরণসহ ৩০১ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ২০১৪ সালে দুজন সাংবাদিক খুন হন এবং ২৩৯ সংবাদকর্মী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হন। ২০১৬ সালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রভাবশালী ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, সন্ত্রাসী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতন, হামলা, মামলা, হুমকি, হয়রানিসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১১৭ সাংবাদিক। তাঁদের মধ্যে একাধিক জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিকও রয়েছেন।

গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১২ সালে ২১২টি ঘটনায় ৫১২ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে সাগর-রুনি দম্পতির হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফ্রিডম হাউসের ২০১৩ সালের সমীক্ষায় বলা হয়, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিচারে বিশ্বের ১৯৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫। এর আগে ওই প্রতিষ্ঠানের হিসাবে ২০১২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১২। (প্রথম আলো, ২০১৫)।

গত বছর সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট (আইএফজে) যে প্রতিবেদন (২৫তম) প্রকাশ করেছে তাতে উল্লেখ করা হয়, 'বাংলাদেশে ২৫ বছরে ২৫ সাংবাদিক খুন হয়েছেন।' তবে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা গেছে, গত দুই দশকে বাংলাদেশে ৩৮ সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। তাঁরা হলেন– দৈনিক বীর দর্পণের সম্পাদক মীর ইলিয়াস হোসেন, দৈনিক অনির্বাণের প্রতিনিধি নহর আলী, দৈনিক জনকণ্ঠ বিশেষ প্রতিনিধি শামছুর রহমান, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রতিনিধি আহসান আলী, দৈনিক পূর্বাঞ্চলের রিপোর্টার হারুনুর রশিদ খোকন, দৈনিক খোলা চিঠির সহকারী সম্পাদক সৈয়দ ফারুক আহমেদ, দৈনিক অনির্বাণের সাংবাদিক শুকুর হোসেন, বিবিসি এবং দৈনিক নিউ এজের প্রতিনিধি মানিক সাহা, দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদক হুমায়ুন কবির বালু, দুর্জয় বাংলার নির্বাহী সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী, দ্য নিউ এজের সাংবাদিক আবদুল লতিফ পাপ্পু, দৈনিক আজকের কাগজ এবং ইউএনবির প্রতিনিধি কামাল হোসেন, দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো চিফ শেখ বেলাল উদ্দিন, দৈনিক কুমিল্লা মুক্তকণ্ঠের সম্পাদক মুহাম্মদ গোলাম মাহফুজ, দৈনিক সমকালের ফরিদপুর ব্যুরো প্রতিনিধি গৌতম দাস, এনটিভির রাঙ্গামাটি জেলা প্রতিনিধি জামাল উদ্দিন, এনটিভির আতিকুল ইসলাম আতিক, মুক্তমনের প্রতিবেদক নুরুল ইসলাম ওরফে রানা, সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়ের নির্বাহী সম্পাদক এমএম আহসান হাবিব বারী, দৈনিক ইনকিলাবের সংবাদদাতা ও রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি আবুল হাসান আসিফ, এটিএন বাংলার সিনিয়র ক্যামেরাম্যান শফিকুল ইসলাম টুটুল, সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধি ফতেহ ওসমানী, বরিশালের মুলাদী প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনির হোসেন, দৈনিক জনতার সহ-সম্পাদক ফরহাদ খাঁ ও তার স্ত্রী রহিমা খানম, আজকের সূর্যোদয় পত্রিকার সাংবাদিক মাহবুব টুটুল, সাপ্তাহিক বজ্রকণ্ঠের সাংবাদিক আলতাফ হোসেন, দৈনিক ভোরের ডাকের প্রতিনিধি ফরিদুল ইসলাম রঞ্জু, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি, দৈনিক গ্রামের কাগজের প্রতিনিধি জামাল উদ্দিন, দৈনিক বিবিয়ান-ার প্রতিবেদক জুনেদ আহমদ জুনেদ, দৈনিক নরসিংদীর বাণীর প্রতিবেদক তালহাদ আহমেদ কাবিদ, সাপ্তাহিক মূলস্রোত পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ, বিটিভির ক্যামেরাম্যান শহিদুল ইসলাম, প্রবীণ ফটোসাংবাদিক আফতাব আহমদ, সাপ্তাহিক অপরাধ দমন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক দুর্জয় চৌধুরী দীপু ও সাংবাদিক সদরুল আলম নিপুণ। যাদের ব্যক্তিগতভাবে নয়, বরং সমাজের অপরাপর মানুষের পক্ষে মিডিয়ায় সত্য তুলে ধরার কারণেই জীবন দিতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে আবার সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি দক্ষিণাঞ্চলের সাংবাদিক। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেখা গেছে, কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সাংবাদিক নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত।

সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো সমকাল পত্রিকার ফরিদপুর ব্যুরোপ্রধান গৌতম দাস হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকায় ঘটনার প্রায় সাড়ে সাত বছর পর ২০১৩ সালের ২৬ জুন নয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

এছাড়া বিভিন্ন তথ্যমতে, ২০১২ সালে ৫১২ সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে সংবাদ প্রকাশের জেরে ১২৮, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে নির্যাতনের শিকার ২৫৬ এবং খুন হয়েছেন তিনজন। আর ২০১৮ সালে এ সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৪০৪ জনে। এর মধ্যে ২৪১ জন পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে এবং ৬৩ জন সংবাদ প্রকাশের জেরে নিগৃহের শিকার হন। (বণিক বার্তা, ২০১৪)।

সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টে'র (সিপিজে) ২০১৬ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যায় দায়মুক্তি বা বিচার এড়ানোর অভিযোগ তোলা হয়। সিপিজের ওই প্রতিবেদনে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক হত্যার বিচার এড়ানো দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা প্যারিসভিত্তিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের (আরএসএফ) হিসাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৬। ২০১৭ সাল থেকে র‍্যাংকিংয়ে কোনো পরিবর্তন না হলেও রেটিংয়ে কিছুটা অবনতি হয়েছে। ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬। স্কোর ৪৮.৬২। ২০১৭ সালে স্কোর ছিল ৪৮.৩৬। ৭.৬৩ স্কোর নিয়ে তালিকায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে নরওয়ে। আর ৮৮.৮৭ স্কোর নিয়ে সবচেয়ে নিচে রয়েছে উত্তর কোরিয়া। সৌদি আরব ১৬৯ ও যুক্তরাষ্ট্র ৪৫ নম্বরে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ১৩৮, পাকিস্তান ১৩৯, শ্রীলংকা ১৩১, মালদ্বীপ ১২০, নেপাল ১০৬ ও ভুটান ৯৪তম স্থানে। (ডয়েচে ভেলে,২০১৮)।

বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

বর্তমান সরকার গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি খুবই আন্তরিক। গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে পারেন, সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার অসুস্থ, অসচ্ছল ও আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের নিয়মিতভাবে ভাতা বা অনুদান দেওয়ার জন্য ২০১৪ সালের ১ জুলাই 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল-২০১৪' পাস করে।

সম্প্রতি নবম ওয়েজ বোর্ড চালু হয়েছে। আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. নিজামুল হককে প্রধান করে ১৩ সদস্যের নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন করে সরকার। সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার কর্মীদের জন্য মূল বেতনের ৪৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করেছে সরকার, যা ২০১৮ সালের ১ মার্চ থেকে কার্যকর ধরা হয়েছে। এর আগে সংবাদিকদের নতুন বেতন কাঠামো নির্ধারণে ২০১২ সালের ১৮ জুন অষ্টম ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছিল সরকার। এর কয়েক মাস পর ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দেওয়া হয়, যা ২০১২ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর ধরা হয়।

বর্তমান সরকারের তথ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে অনেক ভুঁইফোঁড় অনলাইন ও অনলাইন টিভি রয়েছে। অনলাইন গণমাধ্যম আজকের বাস্তবতা। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও। বাংলাদেশে শুধু নয়, পুরো পৃথিবীতে অনলাইন মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। এ বিস্তৃতি বন্ধ করা সঠিক নয়। তবে এটি যাতে সঠিকভাবে এবং নিয়মনীতির মধ্যে থেকে পরিচালিত হয়, সে কাজটি করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। যেমন– অনলাইনের জন্য নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে, রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনলাইনের যখন রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হবে, নীতিমালার ভিত্তিতে তখন ভুঁইফোঁড় অনলাইনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, কমে যাবে।

সাংবাদিকদের সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ে গুণিজনদের অভিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান বলেছেন, 'একধরনের বিশেষ রাজনৈতিক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তারপরও বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনীয় দেশগুলোর মধ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা মাঝারি পর্যায়ে আছি। কারও কারও তুলনায় কিছুটা ভালো আছি।'

তিনি আরও বলেন, দেশে 'মিডিয়া ফ্রেন্ডলি' অনেক শক্তি আছে। সাংবাদিকদের মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন এতটাই বেশি যে সেই শক্তিগুলোর সঙ্গে সমঝোতায় যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আবার সাংবাদিকতা ছাড়াও অনেকে নানা উদ্দেশ্যে এ পেশায় ঢুকে পড়েছেন, এটাও গণমাধ্যমের জন্য ক্ষতিকর।

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের আরেক জন শিক্ষক শামীম রেজা মনে করেন, যেসব জায়গায় বা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা সহিংসতা কিংবা অন্য কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন, সেসব জায়গায় সাংবাদিকদের নিজস্ব কিছু প্রস্তুতি থাকা উচিত। আমাদের একজন স্থানীয় সাংবাদিক হয়তো লেখার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন; কিন্তু পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং কীভাবে ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে হবে, সে প্রশিক্ষণ তাঁর নেই।

বিশ্লেষক এবং সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রা বলছেন, এক দশকে বাংলাদেশে টেলিভিশন, পত্রিকা ও অনলাইনের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়লেও মফস্বল সাংবাদিকদের স্বার্থ উপেক্ষিতই রয়ে গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বলেন, সাংবাদিকের ওপর নির্যাতনের ঘটনা নতুন কিছু না। এটা একধরনের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, যা আগেও ছিল, এখনো আছে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ঘটনার আলোকে বলা যাবে না বাংলাদেশের সাংবাদিকরা ঝুঁকিতে রয়েছে। এজন্য পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সবাইকে আরও সোচ্চার ও সংযত হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ইনস্টিটিউশন অব কমিউনিকেশন স্টাডিজ ও ইউনেস্কোর যৌথ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিনে বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যার বিচার না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ সাংবাদিকদের বিভক্তি বলে উঠে আসে। এছাড়া দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠা, অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার দুর্বলতা, যোগ্য লোকের অভাব, বিচারক সংকট ইত্যাদি অন্যতম। শুধু সংগঠন থেকে নয়, পেশাগত জায়গা থেকেও একজন রিপোর্টার নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে পারেন বলে নিজেদের নৈতিকতা, সাহসিকতা দিয়ে ধারাবাহিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত উঠে আসে আলোচনাসভায়।

গোলাম মোর্তোজার মতে, 'সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি মূলত রাষ্ট্রের চলমান রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আর রাজীর অভিমত হলো, 'আইনগত নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশে সাংবাদিকতা চর্চায়ও পরিবর্তন আনা জরুরি। সাংবাদিকদের শক্তি অর্জন করতে হবে জনগণের কাছ থেকে। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা অনেকটাই রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে বন্দি হয়ে গেছে, জনগণের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ততা ধীরে ধীরে কমে আসছে। সাংবাদিকতা যদি সাধারণ মানুষের নিবর্তনের চিত্র তুলে ধরতে না পারে, তাহলে জনগণ তাঁদের কথা বলবে না। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা তখন দুর্বল হয়ে পড়বে, হুমকির মুখে পড়বে এ পেশাটি।'

পরিশেষে বলা যায়, সারা বিশ্বে সাংবাদিক নির্যাতন একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা। এ থেকে মুক্ত হওয়া সাংবাদিকতা পেশার জন্য বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ। সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও একটি লক্ষণীয় ইতিবাচক দিক হলো, প্রভাবশালী কায়েমি গোষ্ঠীর ভয়ে আজ পর্যন্ত একজন সাংবাদিকও পেশা ছেড়ে অন্যত্র যাননি। বরং তাঁদের পেশাগত দায়িত্ববোধ আরও বেশি শানিত হয়েছে। সাংবাদিক নির্যাতন রোধে প্রতিটি ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে দুর্বৃত্তদের বিচারের আওতায় এনে সুবিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকতাসংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সুদৃঢ় ঐক্য এবং সর্বোপরি এক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ। এছাড়া নির্যাতিত সাংবাদিকের মানসিক স্বস্তির দিকটিও ভাবা দরকার। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নির্যাতিত সাংবাদিকের পাশে নিজ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়ানোর সংস্কৃতি এ দেশে এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। আর কিছু না হোক, নির্যাতিত সাংবাদিকের আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে রাখতে এর প্রয়োজন রয়েছে। ফলে সাংবাদিকতার প্রতি গণমাধ্যমকর্মীদের আস্থা বাড়বে এবং দৃঢ়ভাবে কাজের মনোবল ফিরে আসবে, যা দেশ ও জনগণ সবার জন্য মঙ্গল।

তথ্যসূত্র

* https://www.dw.com/bn সাংবাদিকতায় সব
* মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া (২০১৪), সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে, দৈনিক বণিক বার্তা, ৩০ আগস্ট, ২০১৪।
* http://bonikbarta.net/bangla/news/২০১৪-০৮-৩০/১২১৬৯/সাংবাদিকদের নিরাপত্তা।
* মাহাবীর হাসান মারুফ (২০১৮), সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নেই, আছে অতিরিক্ত চাপ, এনটিভি অনলাইন, ঢাকা।
* (https://www.ntvbd.com/bangladesh/১৭৮৩৭১ সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা নেই, আছে অতিরিক্ত চাপ)।
* শরিফুজ্জামান (২০১৫), ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে সাংবাদিকতা, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মে ২০১৫।
* সুধাংশু শেখর রায় (২০০৩), সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা।
* https://rsf.org/en/journalists-killed

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমে সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

ইব্রাহিম নোমান

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমকে 'চতুর্থ স্তম্ভ' বলে মনে করা হয়। তাই নানা সময়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা কম হয় না। গণমাধ্যম কি শুধু সংবাদ পরিবেশন করবে নাকি জনমতও গঠন করবে, এটা অনেকেই বুঝতে পারেন না। ফলে দেশ ও রাজনীতির স্বার্থে গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন নিয়ে বিতর্ক সবসময়ই থাকে। বাংলাদেশে অনেক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের আবির্ভাব ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে ভালো। কোনোভাবেই রাষ্ট্রের ক্ষতি না করাটাই মিডিয়ার জন্য শ্রেয়। সাংঘর্ষিক প্রতিবেদন নয়, সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করাই সাংবাদিক বা গণমাধ্যমের কর্মীদের সফলতা। সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমে একটা সত্যকে মিথ্যা বা একটা মিথ্যাকে সত্য করার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। এক্ষেত্রে সাংবাদিককে আরও সচেতন ও সজাগ হতে হবে। এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। এখানে কোনোভাবেই তথ্য আড়াল করা কঠিন। অনলাইনে এখন তো অনেক তথ্য প্রচার হচ্ছে। গণমাধ্যমে সভ্য, সত্য, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো দলের না হয়ে সাংবাদিক তার লেখনীর মাধ্যমে দেশের মানুষকে ভালো কাজে অংশগ্রহণ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেবেন, এটাই সবার প্রত্যাশা। সাংবাদিকদের কোনো দল বা রাজনীতি নেই, আছে তাদের মানবসেবা বা জনকল্যাণ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র ঝুঁকিপূর্ণ এবং যেখানে সন্ত্রাস হয়, সে দেশে সাংবাদিকের নিরাপত্তা দিন দিন কমতে থাকে। তাই গণতন্ত্রের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। আজ সংবাদকর্মীরা স্বাধীনতা ভোগের পরিবর্তে হচ্ছেন নানাভাবে অপমান-অপদস্ত ও নির্যাতিত। তারপরও সাংবাদিকদের ঝুঁকিপূর্ণ এই ব্রত নিয়ে কাজ করতে হয় এবং হবে, কেননা সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা কঠিন হলেও সাংবাদিকের জন্য সম্ভব। শুধু বাংলাদেশের সাংবাদিক নন, সারা বিশ্ব আজ চরম অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত। সাংবাদিকই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বা সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কাজ করেন। গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করা ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়।

সাংবাদিকই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বা সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কাজ করেন। ... পালনে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের কর্মীদের হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব আমার-আপনার, সরকারের এবং সবার

পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের কর্মীদের হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব আমার-আপনার, সরকারের এবং সবার। দেশের সংবাদপত্র ও টিভি মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করছে। আমাদের দেশের ভাষা আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গণমাধ্যম যে ভূমিকা পালন করেছিল, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া সমাজে ভালো কিছু আশা করা যায় না ঠিকই আবার সমাজের সবক্ষেত্রে অর্থবহ পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রের ভূমিকা এখন অনিবার্য। সাংবাদিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজে-সমাজে, দেশে-দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এবং ভালো কাজের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকই 'শান্তির দূত' হিসেবে কাজ করে থাকেন। তরুণ ও উদীয়মান সাংবাদিক তাদের পেশার মানোন্নয়নের জন্য আরও প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সাংবাদিকই পারেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে দেশ থেকে সব ধরনের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে।

আমাদের দেশের মিডিয়ার পথচলা মূলত ব্রিটিশ পিরিয়ডেই। তখন থেকেই আমাদের সংবাদপত্রগুলো পাশাপাশি দুটি ভূমিকা পালন করে এসেছে। একটি হলো সংবাদ পরিবেশন, দ্বিতীয়টি জনমত গঠন। তার মানে, গণমাধ্যম একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে চেতনা তৈরি করেছে এবং জনগণের ভাবনাগুলো তুলে ধরেছে। ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের মিডিয়া এসব ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমাদের দেশে কিছু আলোচিত ব্যবসায়ী আছেন যারা গণমাধ্যমের মালিক হচ্ছেন। তাদের অনেককে নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে মালিকপক্ষ সাংবাদিকের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছেন। নিজেদের স্বার্থে সংবাদ তৈরি ও পরিবেশনে সাংবাদিককে বাধ্য করছেন। তবে বিপরীত চিত্রও আছে। কিছু কিছু গণমাধ্যমের মালিকানা ব্যবসায়ীদের হাতে থাকলেও তারা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন না বা তাদের স্বার্থে সংবাদ পরিবেশনের মতো ঘৃণ্য কাজ করতে সাংবাদিককে বাধ্য করছেন না। এটি গণমাধ্যমের জন্য সুখবর।

এ যুগে মিডিয়া একইভাবে সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি জনমত গঠন করে যাচ্ছে। তবে এখন এর দায়িত্ব আরও অনেক বেশি। দায়িত্বহীন সংবাদ পরিবেশন থেকে মিডিয়াকে বিরত থাকতে হবে। এটি মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে আদায় করা ঠিক হবে না, মিডিয়াকেই বুঝতে হবে তার দায়িত্ব। মিডিয়ার এখন আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। অসংকোচে সত্য প্রকাশ করতে হবে, করার সাহস রাখতে হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলব, এখন আমাদের দেশে গণমাধ্যম খুবই শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ স্বাধীন। এদেশ নানা সময়ে সামরিক শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। তখন সংবাদপত্রের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করা হতো। সেদিক থেকে আমরা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সময় পার করছি। ফলে এখন গণমাধ্যম নানা ইস্যুতে জনমত গঠন করছে, জনগণকে সচেতন করছে। এই যেমন যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রসঙ্গে আমাদের মিডিয়ার একটি শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। মিডিয়ায় যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধের ধরন-ধারণ ও ব্যাপকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে এখন সাধারণ মানুষও বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন।

আমাদের গণমাধ্যমের সাম্প্রতিক ধারায় নতুনত্ব নিয়ে এসেছে সব ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়া (টেলিভিশন ও রেডিও)। আরও হাল সংযোজন অনলাইন সংবাদপত্র। মিডিয়ার এ ব্যাপক বিস্তৃতির চিত্রটি দেখে আমার ভালো লাগে। তাই বলব, সমাজের প্রতি গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতার দাবি করার পাশাপাশি সমাজও তাদের কিছু দাবি পূরণ করবে। সবচেয়ে প্রথম যে দাবি রয়েছে তা হলো– পেশাগত জীবনে সাংবাদিকের নিরাপত্তা।

আমাদের গণমাধ্যমের এখন সবচেয়ে বড়ো সংকট সম্ভবত সাংবাদিকের নিরাপত্তা। খুলনার মানিক সাহা হত্যা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের সাগর-রুনি হত্যা পর্যন্ত দেশজুড়ে আলোড়ন তুলেছে। সাগর-রুনি হত্যার ঘটনাটি তদন্তাধীন। আমি আশা করব, এ হত্যার সঠিক বিচার হবে। গণমাধ্যমকর্মীরা সবসময়ই একটি হুমকির মুখে থাকেন। তাদের নিরাপত্তা বা আলোচিত খুনের ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করা সরকারের দায়িত্ব।

সাংবাদিকতার নিরাপত্তা কোথায়?

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয় গণমাধ্যমকে। সাংবাদিক কখনো শারীরিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন, কখনো শিকার হচ্ছেন হয়রানির। কখনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে। স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর নেমে আসে খড়্গ। হামলা, মামলা আর হয়রানিতে দুর্বিষহ করে তোলা হয় জীবন। গণমাধ্যমের এ আক্রান্ত অবস্থায় দেশের গণতন্ত্র যে রুগ্‌ণতম সময় পার করছে তা অনুমেয়। কেননা গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র অবস্থানের দিক থেকে একই সুতায় গাঁথা। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করলেও পুলিশি নির্যাতনেরও শিকার হতে হয় সংবাদকর্মীদের। যদিও উভয়ই ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে। কিন্তু রাজপথে, বিপজ্জনক মুহূর্তে মাঝে মধ্যে পুলিশই হয়ে পড়ে সাংবাদিকের প্রতিপক্ষ। কিন্তু যতই বস্তুনিষ্ঠ হোক, নিজের বা নিজ গ্রুপের বিপক্ষে গেলেই প্রতিপক্ষ হয়ে পড়েন রাজনীতিবিদরাও। তারাও হুমকি-ধমকি দেন, কর্মক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে সাংবাদিককে 'উপহার' দেন বেকারত্ব। নিজস্ব সুবিধাবাদীদের দিয়ে মামলায় জড়িয়ে দেন রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা। আমলারা করেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নানা হয়রানি। কিন্তু সাংবাদিকতার নৈতিকতায় সাংবাদিক কারও স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু হতে পারে না। অনিয়মের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতেই হয়। ফলে সাংবাদিক হয়ে পড়েন অপছন্দের পাত্র। তাদের গলা টিপে ধরতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন সবাই। অথচ অপছন্দের কথাগুলো তুলে ধরতে হয় দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই। এরশাদ সরকারের সময়ে দেশ ছেড়েছেন অনেক সাংবাদিক, বন্ধ হয়েছে সংবাদপত্র। জিয়া ও এরশাদ সরকারের মার্শাল ল' কোর্টে হয়রানির শিকার হয়েছেন বর্তমান বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের অনেকেই। নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বড়ো ভূমিকা ছিল গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীদের। ফখরুদ্দীন-মঈনউদ্দিন সরকারের সময়ও জেলে থাকতে হয়েছে অনেক সাংবাদিককে।

চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ২০০৫ সালে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের সামনে আচমকা পুলিশি রোষানলে পড়েন বেশ কয়েকজন ক্রীড়া ও ফটো-সাংবাদিক। সেদিন বৃদ্ধ এক ফটো-সাংবাদিকের মুখে জেলার শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তার ঘুষি মারার দৃশ্যটি বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতীক হয়ে আছে।

বিশ্বের অন্য দেশেও সাংবাদিক যে খুব সুরক্ষিত, তা বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সৌদি বংশোদ্ভূত জামাল খাশোগি সৌদি আরব সরকারের প্রতিনিধি দ্বারা ২০১৮ সালের ২ অক্টোবরে ইস্তানবুলে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসে গুপ্তহত্যার শিকার হন। তিনি ওয়াশিংটন পোস্টের একজন সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন। যিনি আগে আল-এরাব নিউজ চ্যানেলের সাধারণ ব্যবস্থাপক এবং মুখ্য সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

অলাভজনক সংস্থা আরএসএফ মুক্ত গণমাধ্যমের পক্ষে বিশ্বজুড়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ২০০২ সাল থেকে তারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচক প্রকাশ করছে, যার মাধ্যমে দেশগুলোর মধ্যে গণমাধ্যম কতটা মুক্তভাবে কাজ করতে পারে, তার একটি তুলনামূলক অবস্থার কথা জানা যায়। এ বছরের তালিকা অনুযায়ী মুক্ত গণমাধ্যমের প্রথম পাঁচটি স্থান পেয়েছে ইউরোপের পাঁচ দেশ। নরওয়ের পরে এ চারটি দেশ হলো যথাক্রমে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্ক। তালিকার সবার শেষে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান। আর তলার পাঁচে আরও রয়েছে উত্তর কোরিয়া, ইরিত্রিয়া, চীন ও ভিয়েতনাম।

বর্তমান চীনের জিনহুয়া সংবাদ সংস্থার মতো একটি সংস্থা খুললেই হয়। চীনে যে ৪২টি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে, প্রতিটিই শাসকদলের এবং সব সংবাদপত্রের খবর ও ছবির মূল উৎস হলো জিনহুয়া।

আইনি সুরক্ষা

বিশ্বজুড়ে মতপ্রকাশ ও তথ্য পাওয়ার যে আইনি অধিকার সাংবাদিকের রয়েছে, তা প্রতিনিয়তই কমবেশি বদলে যাচ্ছে। সঙ্গে শারীরিক ঝুঁকি আর আর্থিক ক্ষতি তো একরকম সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেনে রাখা ভালো, কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই অধিকার রক্ষায় কাজ করে। অবশ্য আইনি সহায়তা দেয় যেসব সংস্থা, তাদের সংখ্যা সীমিত। সেবাও একটি নির্দিষ্ট আইনি বা ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে তেমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হলো, যারা সাংবাদিককে আইনি এবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার জন্য সুপরিচিত।

মিডিয়া লিগ্যাল ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ (আন্তর্জাতিক)

বেসরকারি এ সংস্থা সাংবাদিকের অধিকার রক্ষায় সহায়তা করে। হোক তা যে কোনো দেশের প্রিন্ট, ব্রডকাস্ট বা অনলাইন, যে কোনো মাধ্যমের।

লন্ডনভিত্তিক গ্রুপটি বিশ্বজুড়ে আইনি সুরক্ষা দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর নেটওয়ার্ক, এমনকি সরাসরি আইনজীবীদের সঙ্গেও কাজ করে। প্রয়োজন হলে তারা আইনজীবীর ফি-ও প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে, কোনো সাংবাদিক যখন কারাগারে যাওয়া বা আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন অথবা কোনো গণমাধ্যম যখন অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায়, এমন পরিস্থিতিতে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে। সাংবাদিকদের যখন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনি সহায়তার দরকার হয়, তখনও সাহায্য করে এমএলডিআই।

অফিস অব দ্য স্পেশাল রেপোর্টেয়ার ফর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন (আমেরিকা)

ওএএস স্পেশাল রেপোর্টেয়ার কাজ করে স্বাধীন ন্যায়পাল হিসেবে। ইন্টার আমেরিকান কমিশন অব হিউম্যান রাইটসে (আইএএইচসিআর) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের কেনো অভিযোগ এলে তারা সেটি তদন্ত করে। এ বিষয়ে কেউ কোনো আবেদন দাখিল করলে তারা আইএএইচসিআরকে সেই আবেদন মূল্যায়ন ও রিপোর্ট তৈরিতে সহায়তা করে। এটি তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি। তার ভিত্তিতে আইএএইচসিআর চাইলে মামলা দায়ের করতে পারে ইন্টার আমেরিকান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটসে। রেপোর্টেয়ার অবশ্য সাংবাদিক বা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি আর্থিক বা আইনি সহায়তা দেয় না। তবে বিবেচনার জন্য তাদের পিটিশন গ্রহণ করে বিনামূল্যে।

অনলাইন মিডিয়া লিগ্যাল নেটওয়ার্ক (যুক্তরাষ্ট্র)

হাভার্ড ইউনিভার্সিটির বার্কম্যান সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যান্ড সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অনলাইন মাধ্যমের সাংবাদিক ও প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে কিংবা হ্রাসকৃত ফিতে আইনি পরামর্শ দেয়। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তাদের বাছাই করা আইনি প্রতিষ্ঠান, ল' স্কুল ও আইনজীবী রয়েছে। ওএমএলএন বিনামূল্যে ব্যবসা কাঠামো তৈরি ও পরিচালনা, কপিরাইট লাইসেন্সিং এবং এর ন্যায়সংগত ব্যবহার, সরকারি তথ্যে প্রবেশাধিকার, কোনো লেখা প্রকাশের আগে পর্যালোচনা (রিভিউ) এবং মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে।

পার্স ফ্রাই হেইডস ফন্ডস (নেদারল্যান্ডস)

২০০৭ সালে ডাচ অ্যাসোসিয়েশন অব জার্নালিস্টস এবং সোসাইটি অব এডিটরস মতপ্রকাশের অধিকার ও তথ্যে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিসরে সহায়তার জন্য 'স্বাধীন মুক্ত সাংবাদিকতা ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে। আমস্টারডামে এবং প্রাথমিকভাবে ডাচ 'মিডিয়া কমিউনিটি'কে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ ফাউন্ডেশন ইউরোপের অন্য দেশেও এমন গ্রুপগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।

রিপোর্টার্স কমিটি ফর ফ্রিডম অব দ্য প্রেস (যুক্তরাষ্ট্র)

২৪ ঘণ্টা (২৪/৭) জরুরি হটলাইনে সাংবাদিক ও আইন পেশাজীবীদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি এই অলাভজনক সংস্থা আদালতের সিদ্ধান্তের অগ্রগতি, মিডিয়া আইন সম্পর্কিত সংবাদ এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকে। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক এ সংস্থা কাজ করে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত সাংবাদিকের জন্য। ফেডারেল ও রাজ্য আদালতগুলোয় পেশাজীবী ও ছাত্রদের অধিকার সুরক্ষায়ও সহায়তা করে রিপোর্টার্স কমিটি। তারা ডিজিটাল সাংবাদিকতার জন্য অঙ্গরাজ্যের ক্রমানুসারে ওপেন গভর্নমেন্ট গাইড, প্রথম সংশোধনী হ্যান্ডবুক এবং রিপোর্টারের অগ্রাধিকার বিষয়ে তথ্যের একটি ধারাবাহিক নির্দেশিকাও তৈরি করেছে।

সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস লিগ্যাল ডিফেন্স ফান্ড (যুক্তরাষ্ট্র)

সরকারি নথিপত্র ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকার জোরালো করতে মামলা দায়ের ও পরিচালনার জন্য এ সোসাইটি একটি তহবিল গঠন করেছে। একই উদ্দেশ্যে নাগরিকদের সংগঠিত, অবহিত এবং লবিং করতেও এ তহবিল ব্যবহার হয়। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে সাংবাদিকদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী (যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুরক্ষা দেয়) বিষয়ে আইনজীবী চিহ্নিত করতেও সাংবাদিককে সহায়তা করে।

অন্যান্য উৎস

ডিরেক্টরি অব লিগ্যাল সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর ইউরোপিয়ন জার্নালিস্টস (ইউরোপ)

ডিরেক্টরি থেকে আন্তর্জাতিক এনজিও, সাংবাদিক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, প্রাইভেট ল' ফার্ম, আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে জানা যাবে, যারা ইউরোপে সাংবাদিকদের আইনি, আর্থিক ও পরামর্শ সেবা দেয়। এর পৃষ্ঠপোষক ইতালির ইউরোপিয়ন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মিডিয়া এবং মিডিয়া ফ্রিডম সেন্টার।

সাংবাদিক ও ব্লগার সুরক্ষা হ্যান্ডবুক

প্রায় ৩০০ পাতার এই হ্যান্ডবুক সংকলন করেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস, দ্য থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক ল' ফার্ম পল হেস্টিংস এলএলপি। এর অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে রয়েছে মানহানি, ব্যক্তি গোপনীয়তার অধিকার, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের গোপন তথ্যাবলি।

নানা নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। প্রশাসন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। আরও আছে মামলার ভয়। সব সময় পাশে থাকে না প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলো। মফস্বলের সাংবাদিকের ওপর পুলিশ ও প্রশাসনের কোনো কোনো সদস্যের নির্যাতনের অভিযোগ প্রায় ওঠে। শুধু তা-ই নয়, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও আক্রোশের শিকার হন অনেকে। একসময় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে চরমপন্থিদের ব্যাপক উৎপাত ছিল। তাদের হামলায় মারাও গেছেন কোনো কোনো সাংবাদিক। আহত হয়েছেন অনেকে। সে ধরনের পরিস্থিতি এখন আর নেই। কিন্তু সাংবাদিকের ওপর চাপ অব্যাহত আছে।

২০১৩ সালের ৬ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে 'নারী' বলে হামলার শিকার হন নাদিয়া শারমিন। শারীরিক নিরাপত্তার অভাব তো আছেই, প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি দেওয়া হয় না, চাকরির নিরাপত্তার অভাব, এসবের মধ্য দিয়েই নানা বাধা উপেক্ষা করে আমাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যম কোনো জনমত তৈরি করতে পারে কি না, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে; কিন্তু সাধারণভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলি থেকে সরকারি তথ্য, সবই পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিক মাধ্যম। এ মাধ্যমে সর্বশেষ সংযোজন হলো ওয়েব-মিডিয়া। তাই দেখা গেছে, কোনো দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হলে প্রথমেই সংবাদমাধ্যমের কার্যালয় তারা দখল করে নেয়।

সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীরা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শুধু নিহত হয়েছেন তা নয়, অনেকে আবার মারাত্মক আহত অবস্থায় পঙ্গু জীবনযাপন করছেন। অনেকে হয়রানির শিকার হয়েছেন, অনেক সাংবাদিক নিউজ কাভার করতে গিয়ে আক্রমণকারীদের রোষানলে পড়ে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন আবার অনেকে কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন। এ পৃথিবীতে সাংবাদিকের নিরাপত্তা বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন। সাংবাদিককে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য জাতি আগ্রহচিত্তে তাকিয়ে থাকে। সাংবাদিক হচ্ছেন জনগণের শক্তি। তাদের লেখনী হবে এমন, যা বারবার পড়তে ইচ্ছে করবে এবং সমাজে কল্যাণ বয়ে আনবে। জাতি পাবে দিকনির্দেশনা। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া জনগণের স্বায়ত্তশাসন কার্যকর থাকে না। তবে সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য আইনি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, দৈহিক নিরাপত্তার বিষয়টি সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে সাংবাদিকের স্বাধীনতা কম, সেখানে গণতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে না। সেখানে সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তদের আবির্ভাব চলে আসে। দুর্নীতি দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্র ও মিডিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই আসুন, সাহসী ও নির্ভীক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দেশে শিক্ষিত ও তরুণদের উৎসাহিত করতে সহায়তা করি। এক্ষেত্রে সব ধরনের সহিংসতা, নৈরাজ্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, অহমিকা দূর করে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। কারণ সাংবাদিকই হচ্ছেন জাতির বিবেক ও দেশের অহংকার। তাই গণতন্ত্র সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শক্তিশালী গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক জনকণ্ঠ

জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই গণমাধ্যমকর্মী সমাজে অবদান রাখে

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর ৩ মে পালিত হয় বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস। এ দিবস পালনের মাধ্যমে স্বাধীন ও মুক্তগণমাধ্যম সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়। তথ্য সংগ্রহ, সংবাদ পরিবেশন, মুক্তগণমাধ্যমে স্বাধীন তথ্যপ্রবাহ ও জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে যারা আত্মত্যাগ করেছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন; তাদের স্মরণ করা, তাদের দায়িত্বশীলতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের স্বাধীন ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতিগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এতে সরকার মুক্তগণমাধ্যমের কার্যক্রম ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের বিষয়ে যত্নশীল হয়। সেই সঙ্গে সবাইকে প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দিবসে কোনো না কোনো প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মূলত সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্বের জন্য যেসব অপরাধ বা ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেগুলো রুখতে যুদ্ধ করা এবং অনলাইন বা ইন্টারনেট যোগাযোগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেসব প্রতিষ্ঠান জনগণের অধিকার রক্ষা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তির অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে, স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মুক্তগণমাধ্যম বা প্রেস এদের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক অধিকার, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রেসকে তার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ও উন্মুক্ত হতে হয়। সংবাদকর্মী, সংবাদমাধ্যমের পেশাভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ, উপযুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তার নিশ্চয়তার বিধান করা না গেলে জনগণের অধিকার ও সমাজব্যবস্থার মূল অঙ্গীকারের বিষয়ে দৃশ্যত প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয় না। বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত হলেও সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিকতা ও সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা ও পেশাভিত্তিক কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো সর্বাত্মকভাবে সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ পরিবেশনসহ

6

গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মী নির্যাতনের ধরন এবং কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের ... চাকরি প্রাপ্তির ও চাকরি যাওয়ার পর। বাইরের ঝুঁকি যেমন– আইনি ঝুঁকি, বেআইনি বা আকস্মিক আঘাত

9

সার্বিকভাবে সাংবাদিকতা পেশার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময়ই কমবেশি প্রশ্নের সম্মুখীন এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়েছে। ফলে চলমানভাবে সংবাদমাধ্যম, সংবাদকর্মী তথা সাংবাদিকতা পেশা একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে স্বীকৃতি নিয়েই সমাজে টিকে থাকছে। সংবাদমাধ্যম, সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকতা পেশার নিরাপত্তার প্রশ্নে আইনগত, সামাজিক ও পেশাগত সুরাহার জায়গাটি দুর্বল থাকায় প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যেই এ পেশায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। গত শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ ইউরোপে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭০ সালের শেষ পর্বে লাতিন আমেরিকা, পরে আশির দশকের শেষ পর্বে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং সর্বোপরি আশির দশকের শেষ পর্ব ও নব্বইয়ের দশকের সূচনা পর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য আমেরিকার দেশগুলোয় গণতন্ত্র তার অবস্থান সুসংহত করে নেয়। গণতন্ত্রের এ অগ্রযাত্রার সঙ্গে একমাত্র দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলো ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকতার নিরাপত্তা সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর হয়নি। বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নানা অসংগতির ফলে বেড়ে যায় বেকারত্ব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা। এমন পরিবেশের মধ্যেই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলোর পাশাপাশি গড়ে ওঠে ব্যক্তি মালিকানাধীন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো। একদিকে সামাজিক বাস্তবতার আলোকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের তাগিদ, অন্যদিকে রাষ্ট্রের পক্ষে বা বিপক্ষে গণমাধ্যমের অবস্থান গ্রহণ শুরু হয়। ফলে যেসব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান নেয়, সেসব সংবাদমাধ্যমের সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে নানা রকম চাপ তৈরি হতে থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমে সরকারগুলোকে সমর্থন করে সংবাদ বা তথ্য পরিবেশন করার কারণে সেসব গণমাধ্যমের দিন দিন জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের ওপর বাড়তে থাকে সামাজিক চাপ। আর এ উভয় প্রেক্ষাপটেই নেতিবাচক ফল ভোগ করতে হয় সাংবাদিক, সংবাদকর্মী তথা সাংবাদিক সমাজকে। সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর বাড়তে থাকে চাপ, নির্যাতন আর বাড়তে থাকে নিরাপত্তার প্রশ্ন। এখনও সংবাদকর্মী, সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের ওপর নানা রকম চাপ অব্যাহত রয়েছে। তারপরও রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের পক্ষে সাংবাদিকতার ভূমিকাকে জোরালো রাখতে কখনো সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, অর্থনৈতিক সহায়তা, আইনগত সাহায্য ও ফেলোশিপ প্রদানের মতো উদ্যোগ নিয়ে থাকতে দেখা যায়।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে অতি বাস্তবমুখী, বেড়ে গেছে তার জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি। মানুষের এই বাস্তবমুখী উন্নত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিজ্ঞানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। আর এক্ষেত্রে তথ্যের বাহক হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের তথ্যপ্রাপ্তিতে প্রযুক্তির নির্ভরতা মানুষের সঙ্গে প্রযুক্তির এক সুনিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। বর্তমানে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নির্ভরতা ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। একদিকে তথ্যপ্রযুক্তির ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা, অন্যদিকে আধুনিক ও নতুন নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্রমবিকাশ মানুষের জীবনকে করছে পল্লবিত ও ব্যাপৃত। বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এদেশে ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তা এক বিপ্লবে পরিণত হয়। বর্তমানে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য পরিবেশন, তথ্যপ্রাপ্তি বা যোগাযোগমাধ্যমের মধ্যে বেতার, টেলিভিশন বা সংবাদপত্রের পাশাপাশি গুরুত্বের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথা ফেসবুক, ইউটিউব, ব্লগের মাধ্যমে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান, মতামত প্রকাশ বা যোগাযোগ করতে পারছেন। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্বারা তথ্যপ্রাপ্তির গতি যেমন বেড়ে গেছে, তেমনি এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা মতামত প্রকাশ বা তথ্য প্রদান করেন, তারাও সিটিজেন সংবাদকর্মী বা সাংবাদিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সিটিজেন সংবাদকর্মী এবং এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমের ওপরও নানা রকম চাপ লক্ষ করা যায়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সংবাদকর্মী ও সংবাদমাধ্যমের ওপর যেমন চাপ আছে, নানা রকম হুমকি আসে, তেমনি ইন্টারনেট যোগাযোগ মাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও নতুন নতুন হুমকি ও চাপ এসে থাকে। এ কারণে এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হুমকির মুখে থাকে আবার এর সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। সাংবাদিক মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং ইমেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন, যার সবই তথ্য সংগ্রহ, তথ্য পরিবেশন বা সাংবাদিকতা কার্যক্রমের সহায়ক উপকরণ। অনেক সময় সংবাদকর্মীদের এসব উপকরণ ব্যবহারের ওপর নিষেধজ্ঞা বা হ্যাক করা হয়ে থাকে। অনেক সময় সংবাদকর্মী অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করে রাখেন, যাতে তিনি ভবিষ্যতে বা প্রয়োজনীয় সময়ে নিজে বা অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু দেখা যায়, ভাইরাসের কারণে তার সেই মূল্যবান তথ্যাদি ইনফ্যাকটেট হয়ে যায়। ব্যবহারের উপযোগিতা আর থাকে না। সাংবাদিকের অনলাইন এবং অফলাইনে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকায় সাংবাদিকতার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি ঢাকায় গণজাগরণ মঞ্চের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ ও পরিবেশন করার কাজে জড়িত থাকার দায়ে একজন ব্লগারকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে। এ ছাড়াও অনেক ব্লগারকে জীবননাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী ও যদ্ধাপরাধীর সুষ্ঠু বিচার কার্যক্রম পরিচালনার কাজে নিয়োজিত একজন বিচারক নির্ভুল বিচার যাতে নিশ্চিত করা যায়, সেজন্য স্কাইপেতে তিনি অভিজ্ঞতা বা মতবিনিময় করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের যাবতীয় তথ্য হ্যাক করার মাধ্যমে হ্যাকাররা অন্যান্য মাধ্যমে সেই তথ্য প্রকাশ করে। এরপর এই বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিচারক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এ হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়াকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। কাজেই ইন্টারনেট মাধ্যমের সুবিধার কারণে বিকশিত যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত সিটিজেন সংবাদকর্মী হিসেবে পরিচিত গণমাধ্যমকর্মীও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন। কাজেই ইন্টারনেটে তথ্য প্রকাশ এবং এ মাধ্যম ব্যবহারের বিষয়টি সর্বজনীন মানবাধিকারের অংশ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে অফলাইন এবং অনলাইন উভয় মাধ্যমেই তথ্য ও মতামত প্রকাশের অধিকারের বিষয় অবাধ, স্বাধীন করার জায়গাটি সুরাহার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মী নির্যাতনের ধরন এবং কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর ঝুঁকির ধরন বহুমাত্রিক এবং কারণগুলো নানামুখী। সংবাদকর্মীদের ওপর অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি আসতে পারে আবার বহিরাঙ্গনের ঝুঁকিও আসতে পারে। অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি যেমন– চাকরি প্রাপ্তির ও চাকরি যাওয়ার পর। বাইরের ঝুঁকি যেমন– আইনি ঝুঁকি, বেআইনি বা আকস্মিক আঘাত। অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি যেমন– নিয়োগপত্র না দেওয়া, নিয়োগ দিলেও তা আইনসম্মত না হওয়া, বেতন নির্ধারণে কারচুপি, বেতন প্রদানে অনিয়ম, প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে বৈষম্য, কাজের উপযুক্ত পরিবেশের নিশ্চয়তার বিধান না করা, চাকরি দেওয়ার শর্তে চাকরিদাতার যে কোনো অন্যায় কাজে সম্মতি আদায়, চাকরিদাতার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের কাজে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীকে ব্যবহার, আকস্মিক চাকরিচ্যুতির পর আইনসম্মত বেনিফিট না দেওয়া প্রভৃতি। আইনি ঝুঁকির মধ্যে দেখা যায়, এদেশে যুগ যুগ ধরে আইনি শৃঙ্খল হাতে-পায়ে পরেই সাংবাদিকদের চলতে হচ্ছে। এর মধ্যে সংবিধানের ৩৯ ও ৪৩ অনুচ্ছেদ, ১৯৬০ সালের দণ্ডবিধি আইন ১২৪(ক), ১৫৩(ক), ১৫৪(ক) এবং ১৯২, ১৯৩, ১৯৫ ও ৪৯৯ ধারা। সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদ, দণ্ডবিধি আইনের ২৮৮ ধারা এবং ১৯২৬ সালের আদালত অবমানা আইন, ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯(ক) ধারা, ১৯৭৩ সালের মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা আইন, ১৮৮৫ সালের তারবার্তা আইন, ১৮৯৮ সালের ডাকঘর আইনের ২৭(খ) ধারা, ১৯৬৩ সালের অশোভন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন, ১৯৩২ সালের বৈদেশিক সম্পর্ক আইন এবং গ্রন্থস্বত্ব আইন, আর অতি সম্প্রতি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। এসব আইনের ধারা, উপধারা বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের দেশে একজন সংবাদকর্মীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষেত্র বাস্তবে কতটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এরপরও সংবাদকর্মীরা কুমিরের পেটে ঢুকে যাওয়া বা লেজের আঘাতে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার ঝুঁকি নিয়েই পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া সাংবাদিকদের ওপর প্রতিনিয়ত রয়েছে বেআইনি ঝুঁকি, নির্যাতন বা আকস্মিক আঘাতের শঙ্কা। যেমন– হত্যার ভয়, সংবাদপত্র সেন্সর করা, বিশৃঙ্খলায় আহত হওয়া, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ভাংচুর, সংবাদমাধ্যমের অফিসে হামলা, সাংবাদিকদের ওপর হামলা-হুমকি, কালো টাকার মালিকদের দাপট, মাফিয়াদের হুমকি, রাজনৈতিক দলের চাপ, অপরাধ জগতের গডফাদারদের চাপ, দুর্নীতিবাজ, মুনাফালোভী, জঙ্গি শাসক, ধর্মীয় উগ্রপন্থিদের হুমকিসহ নানা অপশক্তির সামনে প্রকৃত সাংবাদিকতা এবং

সাংবাদিক সত্যিই বড়ো অসহায়। এর কিছু পরিসংখ্যান কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়কালে প্রথিবীতে মোট ৯৭৫ জন সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯ সালে ৭৪ জন আর ২০০৭ সালে ৭০ এবং ২০১২ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক তথা ৭০ জন গণমাধ্যমকর্মীকে হত্যা করা হয়। আর সর্বনিম্নসংখ্যক সাংবাদিককে হত্যা করা হয় ২০০২ সালে, যার সংখ্যা ছিল ২১ জন। আর ২০১৩ সালে ৭৯ জন, ২০১৪ সালে ৭৩ জন, ২০১৫ সালে ৮১ জন, ২০১৬ সালে ৬২ জন, ২০১৭ সালে ৫০ জন এবং ২০১৮ সালে ৮০ জন সাংবাদিককে হত্যার শিকার হতে হয়েছে। এসব হত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১৯৯২-২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ে যারা খুন হয়েছেন, তাদের মধ্যে ১৬ শতাংশ সংবাদকর্মী মানবাধিকার, ৪২ শতাংশ সংবাদকর্মী রাজনীতিবিষয়ক, ২০ শতাংশ সংবাদকর্মী দুর্নীতিবিষয়ক, ১৫ শতাংশ সংবাদকর্মী অপরাধ সংক্রান্ত, ৫ শতাংশ সংবাদকর্মী ব্যবসা সংক্রান্ত, ১০ শতাংশ সংস্কৃতিবিষয়ক, ৩ শতাংশ খেলাধুলা সংক্রান্ত এবং ৩৫ শতাংশ যুদ্ধের সংবাদ ও তথ্যসংগ্রহের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন।

১৯৯২ সালের পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যেসব সংবাদকর্মী বা গণমাধ্যমকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ১৫ জনের হত্যার বিষয়ে তাদের কেন হত্যা করা হয়েছে, সেসব সুনির্দিষ্ট কারণ জানা গেছে। কিন্তু বাকি ছয়জনের হত্যার বিষয়ে কোনো কারণ চিহ্নিত করা বা জানা সম্ভব হয়নি। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা খুন হয়েছেন তাদের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে ৮ শতাংশ, রাজনীতিবিষয়ক ৩১, দুর্নীতিবিষয়ক ৪৬, অপরাধ সংক্রান্ত ৭৭ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন ও তথ্য সংগ্রহের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকায় ৮ শতাংশ সংবাদকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও ২০০৯ সালের মে থেকে ২০১০ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৪৭ সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন, যাদের মধ্যে ৬১ জনকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। ২০১১ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে বাংলাদেশে ৭ জন সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, ১৭ জন সাংবাদিক আহত হন আর ২ জনকে হুমকি দেওয়ার ঘটনা ঘটে। ২০১২ সালে বাংলাদেশে ৬৯টি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। সেসব ঘটনায় ১৩৭ সাংবাদিক নির্যাতিত হয়। ২১টি হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং একই বছরে ৩ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। যেসব সাংবাদিককে হুমকি দেওয়া হয়েছে বা শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে এমন সব ঘটনার সঙ্গে দেখা গেছে সরকারদলীয় ক্যাডার ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সরাসরি জড়িত। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে এবং ঘটনাগুলোর সুস্পষ্ট কারণ বহুমাত্রিক হয়ে উঠছে।

গণমাধ্যমে কর্মরত নারী সংবাদকর্মীদের ওপর সহিংসতা ও নির্যাতনের ধরন জানতে ২০১৩ সালের আগস্ট থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৯৭৭ জন নারী সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীর ওপর জরিপে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ সাংবাদিক কোনো না কোনোভাবে হুমকির শিকার হয়েছেন। এসব নারী সাংবাদিকের ৩১ শতাংশ সহকর্মীদের দ্বারা, সম্পাদকের দ্বারা, সরকারি কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সংবাদের সোর্স দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদের ৬৪ ভাগ নারী সাংবাদিকই যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন, যাদের ৪৫ শতাংশ মানসিক ট্রমায় ভুগছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এসব নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে মাত্র ৩৫ শতাংশ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ শতাংশ সাংবাদিকের ফোনালাপ ট্র্যাক করা হয়, ১০ শতাংশকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, ১০ শতাংশকে মোবাইল ফোনে বার্তা দিয়ে, নয় শতাংশকে ওয়েবসাইট হ্যাক করে, ৪ শতাংশকে ভাইরাস দ্বারা তথ্য ধ্বংস করে, ৭ শতাংশ সাংবাদিকের আবাসিক ঠিকানার অপব্যবহার করে, ৬ শতাংশ সংবাদকর্মীকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে আর ৫ শতাংশ সাংবাদিকের ডেস্কে চিরকুট দিয়ে ভয় দেখিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে, যার ৫২ শতাংশ ঘটনাই ঘটেছে গবেষণা চলাকালীন আর ৩৮ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে এর আগে। পৃথিবীব্যাপী যারা ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক, তাদের মধ্যে ২৯ শতাংশ এবং যারা কোনো না কোনো গণমাধ্যমে সরাসরি সম্পৃক্ত তাদের মধ্যে ১১ শতাংশ মনে করে তারা সাংবাদিকতা পেশায় নিরাপদ নন। কারণ হলো তাদের লিঙ্গ, জাতীয়তা, বয়স, মিডিয়া হাউসের পরিবেশ, ধর্ম, ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জাতি-উপজাতি, তাদের প্রতি অর্পিত অ্যাসাইনমেন্টের ধরন, সংবাদমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশের ধরন– সবই সংবাদকর্মীদের নির্যাতিত হওয়ার পেছনে ভূমিকা রেখে থাকে। ২০১৫ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৭ শতাংশ সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন কমিউনিটির লোকজনের কাছে, ১৩ শতাংশ অপরিচিত কারও দ্বারা, ১১ শতাংশ কোনো পরিকল্পিত গ্রুপ দ্বারা, ৮ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তার কাছে, ৭ শতাংশ সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনায় থাকেন এমন কারও দ্বারা, ৫ শতাংশ সহকর্মীর কাছে, ৪ শতাংশ নিরাপত্তাকর্মীর আশ্রয়ে, ২ শতাংশ সম্পাদকের দ্বারা এবং ১ শতাংশ সংবাদ সংগ্রহ কাজে সহায়তাকারী ক্যামেরাম্যান, ক্রুদের কাছে। বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার হলো দেশের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে সমতার বিধান নিশ্চিত করা। কিন্তু এটিই সত্য যে দেশের মধ্যে নানা সেক্টরে বিভিন্নভাবে নারী বৈষম্যের শিকার। সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম তথা সাংবাদিকতা পেশায়ও নারী পিছিয়ে আছেন। এ পেশায় যারাই আসছেন, তারাও নানা বৈষম্যের শিকার, যা সাংবাদিকতা পেশায় নারীর উপস্থিতি কমিয়ে আনার অন্যতম কারণ। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে বাংলাদেশ সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, ৬০ শতাংশ নারী সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী তাদের কর্মক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে বৈষম্যের শিকার, ৫২.৭০ শতাংশ নারী সংবাদকর্মীর অভিযোগ, তারা নানা কৌশলে যৌন হয়রানির শিকার, ৪৭.৩০ শতাংশ নারী সংবাদকর্মীর প্রতিবেদন সেন্সর করা, ছিঁড়ে ফেলা, ব্যবহারের উপকরণ ভাংচুর করা বা হত্যার হুমকির মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে বাংলাদেশ সম্পর্কিত ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মিডিয়ায় নারী সংবাদকর্মী বা সাংবাদিকদের উপস্থিতি অনেক কম। বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজের মাত্র ৭ শতাংশ নারী সংবাদকর্মী সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত। মিডিয়া হাউসগুলোয় মাত্র ০.৬০ শতাংশ নারী সাংবাদিক যারা সম্পাদকীয় বা ব্যবস্থাপনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত– এমন পদে কর্মরত আছেন। ওই প্রতিবেদনে যাদের মতামত সমন্বয় করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশের মতামত হলো তারা স্বল্পমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক না হয় মৌখিক চুক্তিতে কাজ করেন। নারী সংবাদকর্মীদের অভিযোগ হলো, তারা একই সমান কাজের জন্য পুরুষ সংবাদকর্মীর চেয়ে অনেক কম বেতন বা সম্মানি পেয়ে থাকেন। নারী সংবাদকর্মীদের আরেকটি অভিযোগ হলো, তাদের যে বেতন দেওয়া হয় তা-ও অনিয়মিত। যখন তাদের চাকরি চলে যায় এবং এ পেশা ছেড়ে যান, তখন তাদের কোনো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি অনেক মিডিয়া হাউসের ব্যবস্থাপনা অস্বীকার করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত পর্যালোচনার আলোকে এ কথা বলা যায়, সাংবাদিকদের নির্যাতন বা নানা ধরনের ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তা দিতে হলে সরকারকেই সর্বাগ্রে উদ্যোগী হয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে সাংবাদিকদের মধ্যে যে বিভক্তি, অনৈক্য ও মতভেদ লক্ষ করা যাচ্ছে, তার অবসান ঘটিয়ে একটি শক্তিশালী সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠন করতে হবে। যে ইউনিয়ন কোনো সাংবাদিক নির্যাতিত হলে, কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার হলে তার কার্যকর প্রতিবাদ করা, ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ওই সংবাদকর্মীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। সংবাদকর্মীর অধিকার, নিরাপত্তা যা-ই হোক না কেন, তা নিশ্চিত করবে। অনেক সময় সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী নিজেদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণেও নির্যাতিত হয়ে থাকেন। সাংবাদিকতার রীতিনীতি, নিয়মকানুন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকা এবং তা অনুসরণ না করার কারণে অনেক সময় সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন। কাজেই সংবাদকর্মীকে তাদের কর্তব্য কর্ম, পেশা ও দায়িত্ব এবং অনুসরণীয় বিধিবিধান সম্পর্কে ভালো মতো জানতে হবে। পরিশেষে বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীই প্রকৃত পক্ষে দুর্বল ও দারিদ্র্যের হুমকির সম্মুখীন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যে জাতি যত উন্নত, সে জাতি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তত শক্তিশালী। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে কোনো দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, দারিদ্র্যদূরীকরণ, সাংস্কৃতিক স্বচ্ছতা, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সেজন্য জরুরি প্রয়োজন হলো তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধাদি দেশের সব শ্রেণির মানুষের জন্য অবাধ ও সহজলভ্য করা। কারণ যোগাযোগ বা সংবাদমাধ্যমের সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে রয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেটের প্রভাবে তৈরি হওয়া ফেসবুক, ইউটিউব চ্যানেলগুলোর এমন একটি প্রচার কাঠামো বা যোগাযোগ ফ্রেম তৈরি করা যাতে খবর, ব্যাখ্যা, তথ্য পরিবেশন, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি কাঙ্ক্ষিত সমাজ

গঠনের অনুকূলে কাজ করে। কারণ সংবাদমাধ্যমে বাহিত তথ্য মানুষের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য লাভের ধাপকে এগিয়ে দেয়। আর এ অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য মানুষের জ্ঞান, মনোভাবে, কর্মকুশলতায়, আচার-আচরণে, সরল চরিত্র গঠনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনে। আর বড়ো কথা হলো, আইনের শাসন নিশ্চিত করা না গেলে সাধারণ নাগরিকের মতো সাংবাদিকও পেশিশক্তির ভয়ে শঙ্কিত থাকবেন। কালো টাকার মালিকদের দাপট, মাফিয়াদের হুমকি, রাজনৈতিক দলের চাপ, অপরাধ জগতের গডফাদারদের চাপ, দুর্নীতিবাজ, মুনাফালোভী, জঙ্গি শাসক, ধর্মীয় উগ্রপন্থিদের হুমকিসহ নানা অপশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হবেন, নির্বিচারে সত্য গোপন করবেন, তাতে প্রকৃত সাংবাদিকতা ও সাংবাদিক সত্যিই অসহায় হয়ে পড়বেন। এতে বিচারের বাণী শুধু নীরবে-নিভৃতে কাঁদবে। আমাদের দায়িত্বশীল সমাজের অন্যতম কারিগর সাংবাদিক তথা মুক্ত সংবাদমাধ্যম ও স্বাধীন সাংবাদিকতা পেশার অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। আর তা না হলে সত্য প্রকাশের অধিকার হবে দলিত। আশার কথা হলো, ২০০৯ সালের পর থেকে বাংলাদেশে যে সরকার ক্ষমতাসীন, তারা বাংলাদেশে অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের বিষয়টি শক্তিশালী করতে এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ও সব নাগরিকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত করতে কমিউনিটি রেডিও চালুকরণ, পরিচালনা ও তথ্য পরিবেশনবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তথ্য অধিকার আইন এবং কার্যকর একটি তথ্য কমিশন গঠন করেছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করেছে, হুইসেল ব্লয়ার অ্যাক্ট ২০১১ প্রণয়ন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন এবং সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের জন্য অষ্টম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণা করেছে, যা ছিল বাংলাদেশের সংবাদিক সমাজের দীর্ঘদিনের দাবি। আর নবম ওয়েজ বোর্ডের ঘোষণা আসতে পারে শিগগিরই। সরকারের এই ইতিবাচক উদ্যোগগুলো নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশে সংবাদকর্মী, সংবাদমাধ্যমের বিকাশের পথকে কিছুটা হলেও সুগম করতে সহায়ক হয়েছে।

তথ্যসূত্র

* সাংবাদিক নির্যাতনের ধরন, কারণ ও প্রতিকার (প্রবন্ধ), মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ভোরের কাগজ, ৩ মে ২০০৩।
* তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়ন ও ইন্টারনেটের প্রভাব (প্রবন্ধ), মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ভোরের কাগজ, ২০ মে ২০০৩।
* Journalist killed in Bangladesh- committee to protect journalist. www.cpj.org/killed/asia/bangladesh
* Bangladesh: UN Universal Periodic Review Submission- IFEX. www.ifex.org/bangladesh/2012/10/10/ bangladesh_ article_19/
* লোকসংবাদ, মেঠোবার্তা (ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত), মাসিক প্রকাশনা, মার্চ-মে সংখ্যা, ২০০৩।
* Violence & harassment against women in news media: a global picture.
* Attacks and harransment: the impact on female journalist and their reporting, by Dr. Michelle Ferrie, TOLL BUSter.com
* আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দিবস: বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের ধরন, (সবার কথা মাসিক পত্রিকা, মে ২০১৩, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা)

লেখক: উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমবিষয়ক গবেষক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাংবাদিকের পেশাগত সুরক্ষা

গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের মতামত

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা বারবার হয়রানির শিকার হচ্ছেন। কখনো সংবাদ সংগ্রহের সময় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন আবার কখনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা। বাংলাদেশে অনেক আইন হয়েছে। সাংবাদিকদের নীতিমালা হয়েছে। সম্প্রতি সাইবার নীতি হয়েছে। কিন্তু কোথাও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বা সুরক্ষার জন্য আইন হয়নি। রাস্তাঘাটেও সাংবাদিক নিরাপত্তার খুব অভাব। রাস্তা পারাপারের সময় অনেক সাংবাদিক মারা যাচ্ছেন। কোথাও তাঁদের প্রতিকার নেই। সাংবাদিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছেন **মো. কবির হোসেন কাব্য**। সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে তাঁদের কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। নিরীক্ষার পাঠকদের জন্য তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো:

“পৃথিবীতে বর্তমান সাংবাদিকতা অতীতের ক্লাসিক্যাল সাংবাদিকতা থেকে সরে এসেছে। অথচ সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল প্রবল ... করপোরেট হাউসের মুখপাত্র হিসেবে সাংবাদিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে ভালো সাংবাদিকতা হচ্ছে না সেটা কিন্তু নয়,”

ইকবাল সোবহান চৌধুরী

নিরীক্ষা: বিশ্ব এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতা পেশাটি কতটা নিরাপদ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

ইকবাল সোবহান চৌধুরী: বাংলাদেশ এখন অতীতের তুলনায় বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিত নাম। সর্বশেষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেখানে আমেরিকা, ইউরোপ আদিবাসীদের আশ্রয় দিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমানবিক ভূমিকা পালন করে। একমাত্র ইউরোপের জার্মানিতে অ্যাঞ্জেলা মার্কেল অভিবাসীদের নিয়ে বেশ উদার মানসিকথা দেখিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ে যে উদার মানসিকতা দেখিয়েছে, সে কারণে বাংলাদেশ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট মর্যাদার আসনে আছে। ফলে বাংলাদেশের মিডিয়া এখন বিদেশে অনেকের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের মিডিয়ার বড়ো ভূমিকা আছে। সাংবাদিকতা বিশ্বব্যাপী একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। যেমন– সেনাবাহিনীর শত্রু মোকাবিলা করতে হয়, ট্রেনিং নিতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকতে হয়। পাইলটকে প্রতিটি মুহূর্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে এদের ঝুঁকিটাই পেশা। আর সাংবাদিকতা পেশাটি উন্মুক্ত।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিক নিরাপত্তার বা সুরক্ষার জন্য কতটুকু অনুকূল?

ইকবাল সোবহান চৌধুরী: সাংবাদিকতাকে বলা হয় রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তবে এটা আনডিক্লেয়ার। অন্য স্তম্ভগুলো ডিক্লেয়ার। প্রকাশিত তিনটি স্তম্ভের সঙ্গে চতুর্থ স্তম্ভ মিলে রাষ্ট্র। এ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্র। এ স্তম্ভের যে কোনো একটি যদি দুর্বল হয়, তাহলে স্তম্ভের ওপরে থাকা প্লাটফর্ম নড়বড়ে হবে। তাই চতুর্থ স্তম্ভটি শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের সংবিধানে সাংবাদিককে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা আছে। যেমন– মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবাদিকতা পেশাকে স্বীকৃতি দেওয়া। সমাজ, অর্থনীতি, গণতন্ত্র সবকিছুর সঙ্গে সাংবাদিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশ যখন অর্থনীতিতে অগ্রসর হবে, সাংবাদিকতা ততটা এগিয়ে যাবে। দেশ যখন গণতান্ত্রিকভাবে অগ্রসরমান হবে, সাংবাদিকতা ততটা এগিয়ে যাবে। দেশে গণতন্ত্র যত বেশি প্রাতিষ্ঠানিক থাকবে, সাংবাদিকতা তত উন্মুক্ত থাকবে। সাংবাদিকতার জন্য গণতন্ত্র হলো অক্সিজেন। গণতন্ত্র যত প্রাতিষ্ঠানিক থাকবে, সাংবাদিকতা তত মতপ্রকাশের সুরক্ষা পাবে। রাষ্ট্রকে সাংবাদিকের পক্ষে থাকতে হবে। যেমন ধরুন, কোনো পুলিশ সদস্য দায়িত্বরত অবস্থায় আহত হলেন, তখন তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্র নেয়। তাঁর বিরুদ্ধে যদি কেউ আঘাত করে, সেটিও রাষ্ট্র দেখে। সাংবাদিক তো সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছেন। সাংবাদিক কারও বিরুদ্ধে তথ্য দিলে তাঁর ওপর আক্রমণ করছে। সত্য তথ্য দেওয়ায় যদি তাঁর ওপর আক্রমণ হয়, তখন রাষ্ট্র যদি সাংবাদিকদের পক্ষে না থাকে– নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে সুস্থ ও সুষ্ঠু সাংবাদিকতা হবে না।

নিরীক্ষা: সাংবাদিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কোনো আইন আছে কি?

ইকবাল সোবহান চৌধুরী: সাংবাদিককে নিরাপত্তার জন্য নয়। একজন নাগরিক হিসেবে নিরাপত্তার আইন আছে, সুরক্ষা আছে। আমার ডিউটি পালন করার জন্য নিরাপত্তার অধিকার আছে। সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য আগে অনেক বাধা ছিল। বর্তমানে অবাধ তথ্য আইনের মাধ্যমে অনেকটা বাধা দূর করা হয়েছে। তবে এটি অনুশীলনের ব্যাপার। সেটা অবশ্য পুরোপুরি আসেনি আমাদের মধ্যে। সাংবাদিককে কেউ স্বাধীনতা দেবে না। সাংবাদিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রতিবাদী হয়ে, সাহসী হয়ে, অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর নিরাপত্তাহীনতা যদি মিডিয়ায় বিরাজ করে, সেখানে কোনো সাহসী, আদর্শিক, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা হবে না।

নিরীক্ষা: বিচারহীনতার সংস্কৃতি সাংবাদিক সুরক্ষার জন্য হুমকি নয় কি?

ইকবাল সোবহান চৌধুরী: সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। আমাকে কেউ অবাধ স্বাধীনতা দেবে না। আমাদের আশপাশে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে, থাকবে। এটা অতিক্রম করে সত্যের পথে যেতে হবে– এটাই হলো সাংবাদিকতা।

ফরিদা ইয়াসমিন

নিরীক্ষা: বিশ্ব এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতা পেশা কতটা নিরাপদ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

ফরিদা ইয়াসমিন: সাংবাদিকতা পেশা ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ পেশায় যারা আসেন, তারা জেনেই আসেন। কারণ মানুষের জন্য কাজ করতে হলে জীবনে নানা ঝুঁকি নিতেই হয়। বাংলাদেশেও সাংবাদিকতা পেশায় ঝুঁকি আছে। সাংবাদিক এ ঝুঁকির বিষয়টি জেনেই সাহসের সঙ্গে নানা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে কাজ করছেন।

নিরীক্ষা: বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশেও সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এর পেছনের মূল কারণগুলো কী বলে আপনি মনে করেন?

ফরিদা ইয়াসমিন: সাংবাদিক হত্যার পেছনে অনেক কারণ। কখনো ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ থাকে। আবার কখনো রাজনৈতিক কারণ। যখন কোনো সাংবাদিক সত্য কথা লেখছেন, তখন সংবাদটি কারও না কারও বিপক্ষে যায়। তখন পেশিশক্তির মাধ্যমে আবার কখনো রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী তারা বিষয়টি পছন্দ করেন না বা মেনে নিতে চান না। তখনই সাংবাদিককে হুমকি দেয়। তখন তাঁর জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। মূলকথা একটাই– কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত লাগলেই তখন সেই সাংবাদিককে নানা হয়রানির শিকার করেন।

নিরীক্ষা: বিদ্যমান আইন সাংবাদিকতায় কতটা সুরক্ষা দিচ্ছে? সাংবাদিক সুরক্ষার ব্যাপারে আপনার কী কী পরামর্শ রয়েছে?

ফরিদা ইয়াসমিন: সাধারণ আইনের বাইরে সাংবাদিক সুরক্ষার কোনো আইন নেই। বর্তমানে ডিজিটাল সিকিউরিটিতে সেখানে দেখা যাচ্ছে সাংবাদিক সুরক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে কখনো কখনো আইনের অপপ্রয়োগের শিকার হচ্ছেন সাংবাদিক। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের যে আইনের ধারায় সাংবাদিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন বা অপপ্রয়োগ হচ্ছে, সেই ধারাগুলো বাতিল করতে হবে। সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যে ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, সেগুলো যাতে না হয়। সেই আইনগুলো হতে পারে সাংবাদিক সুরক্ষার জন্য। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে সাংবাদিককে হয়রানি করে এবং প্রমাণিত হয়। সেই অপপ্রয়োগকারীকে সাজা দেওয়ার একটা বিশেষ আইন থাকতে হবে।

কাবেরী গাইন

নিরীক্ষা: বিশ্ব এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতা পেশাটি কতটা নিরাপদ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

কাবেরী গাইন: সাংবাদিকের নিরাপত্তার কথা এলে তিনটি বিষয় সামনে আসে। এক. শারীরিক নিরাপত্তা, দুই. জীবনের নিরাপত্তা, তিন. চাকরির নিরাপত্তা। পৃথিবীতে বর্তমান সাংবাদিকতা অতীতের ক্লাসিক্যাল সাংবাদিকতা থেকে সরে এসেছে। অথচ সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটি জায়গা থেকে। আজকের সাংবাদিকতা করপোরেট পুঁজি/হাউস নিয়ন্ত্রণ করছে। করপোরেট হাউসের মুখপাত্র হিসেবে সাংবাদিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে ভালো সাংবাদিকতা হচ্ছে না সেটা কিন্তু নয়, তাদের স্বার্থকে আঘাত করা যাচ্ছে না। ফলে দেখা যাচ্ছে, যখন কোনো সাংবাদিক নিউজ করছেন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মহলের বিরুদ্ধে, হাউস যদি মনে করে নিউজটির জন্য তাদের সমস্যা হতে পারে, তখন হাউস থেকে নিউজটি সাংবাদিককে চেঞ্জ করতে বলে। তখন সাংবাদিক রাজি না হলে চাকরির ঝুঁকিতে থাকেন। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকা সাংবাদিক খুব বেশি অনিরাপদ। সেখানেও সাংবাদিক খুন হচ্ছেন, আহত হচ্ছেন। প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তিরা খুন করছেন, আহত করছেন সাংবাদিককে। আজ সাংবাদিকের নিরাপত্তার বিষয়টি– নিউজটি যদি ক্ষমতাধরদের পক্ষে থাকে, সেক্ষেত্রেই আপনি সেভ। এছাড়া এর বাইরে নিউজ করলেই সাংবাদিক শারীরিক ও জীবিকার নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। সাংবাদিকতা আপস হচ্ছে জীবন ও জীবিকার কাছে আর মানিয়ে চলতে হচ্ছে রাজনৈতিক ও করপোরেট পুঁজির সঙ্গে। সাংবাদিকতার জৌলুস হারিয়েছে, সেই গ্লামারটা নেই। সত্যের পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কোনো দেশের পেশাজীবী যখন রাজনৈতিক দল ও অনুগত দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন যা হওয়ার তা-ই হয়। বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় সাংবাদিকদের মধ্যে যে অনৈক্য, এটিই মূল কারণ বলে আমি মনে করি। যখন পেশাজীবীর ওপরে রাজনৈতিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ, তখন আর নীতিনির্ধারকরা সাংবাদিকের স্বার্থের জন্য কাজ করেন না।

নিরীক্ষা: সাংবাদিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যাপারে পুলিশ কি ভূমিকা পালন করতে পারছে?

কাবেরী গাইন: কেন সাংবাদিক মনে করবেন বা দাবি করবেন পুলিশ তাঁদের প্রটেক্ট করবে। পুলিশের অনিয়ম নিয়ে সাংবাদিক কতটুকু লেখছে। কোনো জায়গায় সে নিরাপত্তা দিতে পারছে না– তা অবশ্য নয়, আমাদের পুলিশ দক্ষ, যথাযথ নির্দেশনা পেলে অপরাধীকে ধরে আনতে পারে। যখন পুলিশের মতো একটি সিস্টেম সেটাকেও যখন রাজনীতিকরণ করা হয়, তখন পুলিশ মনে করে তার বস জনগণ নয়, তখন ফোকাসটা জনগণ থেকে সরে গিয়ে সরকারের দিকে চলে যায়। জনগণ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিকই হন, তখন আর হবে না।

নিরীক্ষা: বিদ্যমান আইন সাংবাদিককে সুরক্ষা দিচ্ছে কি? সাংবাদিক সুরক্ষার ব্যাপারে আপনার কী কী পরামর্শ রয়েছে।

কাবেরী গাইন: সাংবাদিকের শারীরিক সুরক্ষামূলক কোনো আইন আমাদের দেশে নেই। সত্যি কথা বলতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের কারিকুলামে সাংবাদিক নিরাপত্তা বিষয়টা নেই। তবে সাংবাদিক সংক্রান্ত কিছু আইন আছে। কিন্তু সাংবাদিক সুরক্ষার আইন আমাদের কারিকুলামে নেই। MRDI নামে একটি সংগঠন সাংবাদিকের সুরক্ষাবিষয়ক ক্যাম্পেইন করছে। সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের এ বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বসে তাঁদের সুরক্ষা আইন করতে হবে।

গণমাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্য ও নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

রীতা ভৌমিক

সাংবাদিকতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। তবে একজন পুরুষ সাংবাদিকের তুলনায় একজন নারী সাংবাদিককে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের বাইরে কাজ করতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সাংবাদিক দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ার নারী সাংবাদিক ভালো রিপোর্ট করছেন। তাদের রিপোর্টে সমাজের মূল সমস্যা ও অবক্ষয় উঠে আসছে।

গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিক দায়িত্বশীলতারও পরিচয় দেন। তবে দায়িত্বের পাশাপাশি একজন নারী সাংবাদিকের সংবেদনশীলতারও প্রয়োজন হয়। সেখানে নারী সাংবাদিক আরও নির্ভরযোগ্য হয়ে কাজ করেন। যে কোনো পররাষ্ট্রনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রতিকূলতা, নারী-শিশুর প্রতি নির্যাতন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, দুর্নীতি রিপোর্ট, এমনকি সম্প্রতি জঙ্গিবাদের উগ্র সহিংসতার মতো বিষয়ের ক্ষেত্রেও নারীরা এমন সব সংবাদ তুলে আনছেন, যা গণমাধ্যমে ভিন্ন মাত্রা আনছে। নারী সাংবাদিকের কাজ শুধু সংবাদমূল্য বাড়িয়ে তোলাই নয়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পথে আজকের বহুল আলোচিত নারী-পুরুষ সাংবাদিকের সমান অধিকারের চেয়ে বড়ো প্রসঙ্গ হলো নারী-পুরুষের সহ-অবস্থান তৈরি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে সার্বিকভাবেই দেশের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণীতে নারীর অবস্থান বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি চাকরিতে নারীর পদোন্নতিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে। কিন্তু গণমাধ্যমে নীতিনির্ধারণে নারী সাংবাদিকের অবস্থান এখনো জোরালো হয়নি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এবারের প্রতিপাদ্যে নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমতা অর্জনের জন্য পরিবর্তন আনতে নারী-পুরুষের সমতার ওপর জোর দিয়েছে জাতিসংঘ। প্রতিপাদ্যে বলা হয়েছে– 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো/নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো।'

নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে দেশের সংবিধানেও নারী-পুরুষের সমতার নির্দেশনা রয়েছে। সর্বক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার ও সুযোগ স্বীকৃত হয়েছে

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এবারের প্রতিপাদ্যে নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমতা অর্জনের জন্য পরিবর্তন আনতে ... 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো/নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো।'

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়ও। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসত্তা নির্বিশেষে সবাই যাতে সমান অধিকার ও সুযোগ ভোগ করতে পারে, সেজন্য জাতিসংঘের উদ্যোগে নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) প্রণীত হয়েছে। এছাড়া গণমাধ্যমে লিঙ্গসমতা না হলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৫ নম্বর লক্ষ্য জেন্ডার সমতা অর্জন কিছুতেই সম্ভব হবে না।

গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিকের অগ্রযাত্রা দৃশ্যমান। প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসারের কারণে নারী সংবাদকর্মীদের কাজের সুযোগ বেড়েছে। বলা যেতে পারে, শহরে শুধু নয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায়ে নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়ছে। নারী সাংবাদিক এখন অর্থনীতি, অনুসন্ধানী, দুর্নীতি, রাজনীতি, কূটনীতি, ক্রীড়া, শিক্ষা, সচিবালয়, জাতীয় সংসদ এবং বিভিন্ন আন্দোলনবিষয়ক রিপোর্টগুলোও করছেন। তারা নাইট শিফটেও কাজ করছেন। গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিক যেমন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছেন, তেমনি গণমাধ্যমের কর্মপরিবেশও কোথাও কোথাও বন্ধুত্বপূর্ণ হচ্ছে। পুরুষ সহকর্মীরা নানা সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। এরপরও নারী সাংবাদিকের চাকরি হারানোর শঙ্কা থেকেই যায়। গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অংশগ্রহণ বাড়লেও সেই সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিক বিভিন্ন বৈষম্যের সম্মুখীন হন। মাতৃত্বকালীন ছুটি নারী সাংবাদিকের মৌলিক অধিকার। এরপরও নারী সাংবাদিকের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়েও অনিয়ম লক্ষ করা যায়। এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান নারী সাংবাদিককে সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে অনীহা প্রকাশ করে। অনেককে ছয় মাসের পরিবর্তে চার মাসের সবেতন ছুটি দেওয়া হয়। মাতৃত্বকালীন ছুটিবৈষম্য একেক কর্মক্ষেত্রে একেক ধরনের। নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় না। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে ডে-কেয়ার সেন্টার এবং সন্তান রাখার সুব্যবস্থা না থাকায় অনেক নারী সাংবাদিকের পক্ষে কাজটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব সামলিয়েও যারা টিকে থাকে, তারা নানা রকম বৈষম্যের শিকার হয়। পদোন্নতি হয় না। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যাওয়ার আগেই তারা ঝরে পড়েন। অর্থাৎ বয়স হওয়ার কারণ দেখিয়েও অনেককে চাকরিতে রাখা হয় না।

ফলে দেখা যায়, আমাদের গণমাধ্যমে নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারী সাংবাদিকের উপস্থিতি এখনো অনেক কম। পুরুষ সাংবাদিক পদোন্নতি পেয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যেতে পারলেও নারী সাংবাদিক নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যেতে পারছেন না। কারণ তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয় না।

গণমাধ্যমে নারীরা যোগ্যতার পর্যায় পার করে একটা পর্যায়ে গিয়ে আর কী করবেন, সেই বিষয়ে একেবারেই শূন্য অবস্থা বিরাজ করছে। কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আছে কি নেই, তার চেয়েও বড়ো কথা– নারী সাংবাদিককে যেখানে যাওয়ার কথা, সেখানে যেতে অদৃশ্য বাধা রয়েছে। যোগ্য হলেই নারী সাংবাদিক নীতিনির্ধারণীতে থাকবেন, এটা নিশ্চিত নয়। কারণ হিসেবে গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিককে নীতিনির্ধারণী অবস্থানে দেখতে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত দীর্ঘদিনের মনোভাব মূলত বড়ো বাধা। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, পদোন্নতি একজন পুরুষ সাংবাদিকের বেশি দরকার। তাকে স্ট্যাটাস ও পরিবার সামলাতে হয়। একজন নারী সাংবাদিককে তা সামলাতে হয় না। এ মনমানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দু-একজন নারী সাংবাদিক নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যদিও যায়, তাঁর একার পক্ষে গণমাধ্যমের এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পুরুষ সহকর্মী থাকলেও নারী সাংবাদিকের অধিকারের বিষয়টি মানবিকভাবে দেখা দরকার। অর্থাৎ বস পুরুষ হলেও তিনি যেন নারীবান্ধব মনোভাব পোষণ করেন নারী সাংবাদিকের প্রতি। গণমাধ্যম ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেই নারী সাংবাদিকের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

২০১৫ সালে বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পের একটি পরিবীক্ষণে জানা যায়, শতকরা ১৯ ভাগ রিপোর্টার নারী এবং শতকরা ৮১ ভাগ রিপোর্টার পুরুষ। সংবাদ উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করে শতকরা ৬৬ ভাগ নারী এবং শতকরা ৩৪ ভাগ পুরুষ।

এটি অবশ্যই এদেশের সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই ফল। এই মানসিকতার চক্রাকারে দীর্ঘদিনের ঘানি টেনে চলছেন নারী সাংবাদিক। তাই গণমাধ্যমে নারীদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আনতে হলে বেসরকারি গণমাধ্যম/প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা ভূমিকা আছে। এক্ষেত্রে নারী সাংবাদিককে নীতিনির্ধারণীতে আনতে সরকারি উদ্যোগে একটি নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। আর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি জোরালোভাবে দেখভালের তাগিদের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

কারণ নারী ও পুরুষ সাংবাদিক সমানভাবে কাজ করছেন। সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অথচ একজন নারী সাংবাদিক পরিবার, কর্মক্ষেত্র দুটিই সমানভাবে দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছেন। একজন পুরুষ সাংবাদিকের চেয়ে একজন নারী সাংবাদিকের চলার পথ অনেকটা কঠিন। অনেক কষ্ট করে তারা বেরিয়ে এসেছেন। এরপরও একটা পর্যায়ে গেলে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। বয়স হলে তাদের চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়। শুধু নারী হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। অথচ যোগ্যতা অনুযায়ী নারী সাংবাদিকের সুযোগ পাওয়ার কথা। তাদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এ জায়গায় যতদিন পর্যন্ত নারী সাংবাদিক যেতে না পারবেন, ততদিন যথার্থ অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন হবে না। তারা যখন এ অবস্থানে যাবেন, তখনই গণমাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি বৈষম্য কমবে। নারী সাংবাদিকের জন্য একটি কর্মোপযোগী পরিবেশ তৈরি হবে।

দুঃখজনকভাবে লক্ষ করা যায়, গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিকের বয়স বাড়লেই কর্মক্ষেত্রে তাদের চাকরির অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এর কারণ, অর্থনৈতিকভাবে একজন নারী সাংবাদিক যখন একটা অবস্থানে অধিষ্ঠিত হন অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাফল্যের অবস্থানে যখন তিনি যেতে শুরু করেন, তখনই তাকে চাকরিচ্যুত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যায়, যা সত্যি দুঃখজনক। আমরা মনে করি, সাংবাদিকতা এমন একটি সৃজনশীল পেশা, যেখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিপক্বতাও বাড়ে। সেসময়ে তাকে যদি চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে শুধু নারী সাংবাদিকই নন, গণমাধ্যমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গণমাধ্যমের কাজগুলো এমনই, যা বয়স ও কর্ম অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে।

গণমাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সাংবাদিকের সমতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ নারী হলে গণমাধ্যমেও অর্ধেক জায়গা নারী সাংবাদিকের জন্য বরাদ্দ রাখা দরকার। এর মূল কারণ গণমাধ্যমে নীতিনির্ধারণী, নেতৃত্বের জায়গাগুলোয় নারী সাংবাদিকের কাজ করার সহায়ক পরিবেশ যতদিন না হবে, ততদিন সমতা আসবে না। এক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি পুরুষ সহকর্মীদের মানসিকতার পরিবর্তনও দরকার। প্রয়োজন পুরুষ সাংবাদিকের সমর্থন। প্রত্যেক মিডিয়া হাউসে সুনির্দিষ্ট 'লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতিমালা' প্রণয়ন করা দরকার। অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব পরিচালনা বিধিবিধান লিঙ্গ সমতাভিত্তিক ও নারী সাংবাদিকবান্ধব করতে হবে।

নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা

গণমাধ্যমের অমসৃণ পথটি মসৃণ করেই নারী সাংবাদিককে চলতে হচ্ছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে তাঁর পেশায় টিকে থাকতে হয়। কারণ নারী হওয়ার কারণে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের ঝুঁকির সম্মুখীনও হতে হয়। শুধু নারী হওয়ার কারণে আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকারও হয়েছেন অনেকে। অনেকে অশ্লীল গালিগালাজ শুনেছেন। এমনকি হত্যার শিকারও হয়েছেন। কখনো কখনো পুলিশি নির্যাতনের শিকারও হতে হয় নারী সাংবাদিককে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে, গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও তাদের নিরাপত্তা কতটুকু? গণমাধ্যমে নারী সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ থাকলেও পেশাগত কারণে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তৈরিতে একজন নারী সাংবাদিককে বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। এর মধ্যে শারীরিক নিরাপত্তার অভাবের পাশাপাশি জীবনের নিরাপত্তাহীনতাও রয়েছে। এরকম নানা বাধা উপেক্ষা করে একজন নারী সাংবাদিক তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত মৌলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়ায় নারী সাংবাদিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তবে বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে নারী সাংবাদিককে আরও সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

ঝুঁকির বিষয়টি মাথায় নিয়েই নারী সাংবাদিক এ পেশায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। তবে 'ঝুঁকি' নিয়ে কাজ করা মানেই এ নয়, কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনকালে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টিকে কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন গুরুত্বসহকারে দেখবে না। সংবাদ সংগ্রহের সময় অথবা কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনের বাইরেও অনেক সময় নারী গণমাধ্যমকর্মীরা নিরপত্তাহীনতার সম্মুখীন হন।

কখনো শারীরিকভাবে আক্রান্ত হন। কখনো শিকার হন হয়রানির। ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করলেই নারী গণমাধ্যমকর্মীরা এ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েন। এর কারণ, সংবাদ বিপক্ষে গেলে সেটা মেনে নেওয়ার মনমানসিকতা সমাজ থেকে উধাও হয়ে গেছে। নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়।

২০১২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি এটিএন বাংলার জ্বালানি বিটের রিপোর্টার মেহেরুন রুনি এবং তাঁর সাংবাদিক স্বামী মাছরাঙা টেলিভিশনের সাগর সারওয়ার নিজ বাসায় নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হন।

২০১৩ সালের ৬ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে 'একাত্তর টেলিভিশনের রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন শুধু 'নারী' সাংবাদিক হওয়ায় হামলার শিকার হন।

সাংবাদিক সাজেদা সুইটি ২০১৪ সালে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হন।

২০১৫ সালে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম একাত্তর টেলিভিশনের সাংবাদিক ফারজানা রুপাকে পরিবারসহ হত্যার হুমকি দেয়।

২০১৮ সালের ২৮ আগস্ট রাত ১০টায় আনন্দ টেলিভিশনের পাবনা প্রতিনিধি সুবর্ণা নদীকে তাঁর বাসায় কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

ওই বছরই ছাত্রদের 'নিরাপদ সড়কের দাবি' আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে চারজন নারী ফটো সাংবাদিক আহত হন। তাঁদের মধ্যে দ্য ডেইলি স্টারের ফটো-সাংবাদিক সুস্মিতা পৃথাও ছিলেন। তিনি ফুটওভারব্রিজ থেকে একটি মিছিলের ছবি তুলতে গেলে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন অস্ত্র হাতে তাঁকে ধাওয়া করে। শুধু তা-ই নয়, তারা তাঁকে আটকে রেখে মিছিলের ছবিগুলো মুছে ফেলতে বাধ্য করে।

নারী সাংবাদিক প্রতিকূল বা বিপৎসংকুল পরিবেশেও সংবাদ সংগ্রহ করেন। এ সময় তাঁদের একই সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ– দুটিরই মুখোমুখি হতে হয়। বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে কিছু অফিস তাঁদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিলেও তাদের দায়দায়িত্ব নেওয়ার সাহস করে উঠতে পারে না। আবার সাংবাদিকরা সবার অধিকার রক্ষায় কাজ করলেও নারী সাংবাদিকের জীবন ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কার্যকর ভূমিকা রাখতে এখনো পারেনি। স্বল্পসংখ্যক এনজিও এসব বিষয়ে কাজ করলেও বিপদের সময় নারী সাংবাদিকের পাশে সব ধরনের সাহায্য নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য কেউ নেই বললেই চলে।

নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টিকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রকে নারী সাংবাদিকের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে হবে। গণমাধ্যমভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করতে পারে। মিডিয়া হাউসগুলোকেও নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। এর পাশাপাশি সমাজের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হবে।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে সব রাষ্ট্র একটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এই সিদ্ধান্তে যৌন ও লিঙ্গবৈষম্যসহ বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের নিন্দা জানানো হয়েছে। নারী সাংবাদিক যে একই সঙ্গে সাইবার জগতেও ভয়ভীতি ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন, তা নিরসনের বিষয়টিকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে। নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রগুলোকে জেন্ডার সংবেদনশীল পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে মানবাধিকার কাউন্সিল।

তবে সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকের কাজের পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে। পুরুষ সহকর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হচ্ছে।

সুপারিশ

* গণমাধ্যমের জন্য জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন।
* নারী সাংবাদিকের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতির জন্য সরকারি-বেসরকারি ও সাংবাদিক ইউনিয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।
* গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিকের সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ তৈরি।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক যুগান্তর

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও এর প্রভাব

নূর ইসলাম হাবিব

ভূমিকা: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা Social Media আমাদের আধুনিক জীবনে এক নতুন বাস্তবতা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গ্রামের চায়ের দোকানে মানুষজন তথ্যের জন্য এখন আর পত্রিকার পাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে না। তার বদলে এসেছে স্মার্টফোন ও আইফোন-নির্ভরতা। গণমাধ্যমে তথ্যের বিপণনের সাবেকি প্রথা এখন আর নেই। চারপাশে, দেশে-বিদেশে কী ঘটছে, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, গুগলপ্লাসসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাচ্ছে সবাই। আমাদের টাইম লাইন, নিউজফিড ভরে যায় প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সংবাদ, ছবি ও ঘটনায়। এ সুযোগটি করে দিচ্ছে ইন্টারনেট। বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭০ ভাগ মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। তরুণদের মধ্যে এ হার আরও বেশি, প্রায় ৯০ ভাগ। বাংলাদেশে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে শতকার ৮০ ভাগ মানুষের রয়েছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট।

ইন্টারনেট মাধ্যমের সুযোগে সামাজিক যোগাযোগের মাত্রা অতীতের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে। ইন্টারনেটে চালু হওয়া সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলো মানবীয় যোগাযোগের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ মানবীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দূরত্বকে পুরোপুরি দূর করে দিচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে কম্পিউটার, স্মার্টফোন ও আইফোন। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি তথ্য, মতামত, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি আদানপ্রদান করতে পারে। এগুলো হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রাণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনলাইন সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের থাকে অনেক উৎস ও প্রাপক। প্রথাগত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের থাকে একটি উৎস ও অনেক প্রাপক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া থেকে আলাদা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে– facebook, messanger, google, instragram, linkedln, pinterest, tumbler, snapchat, twitter, viber, wechat, whatsApp, youtube ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অগ্রপথিক হচ্ছে facebook. ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্ক জুকারবার্গ (Mark Zuckerberg) ফেসবুক নামের নেটওয়ার্কটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে এটি শুধু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমিত ছিল। পরে এই ওয়েবসাইটটি অন্যান্য অঞ্চল ও বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পুরো বিশ্বে জনপ্রিয়তা আর্জন করে। ২০১৭ সালের আগস্টের এক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২০৪ কোটি ৭০ লাখ। গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকায় ৮৪

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে কম্পিউটার, স্মার্টফোন ও আইফোন। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি তথ্য, মতামত, ছবি, ... সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রাণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনলাইন সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে

শতাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ১৩-১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৬০ ভাগের অধিকের অন্তত একটি সামাজিক যোগাযোগ প্রফাইল রয়েছে। তারা দিনে দুই ঘণ্টার বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের দেশের খুব কমসংখ্যক মানুষই ফেসবুক ব্যবহার করেন। তারপরও ছাত্র-শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিশু-কিশোর, গৃহিণী, পেশাজীবী– কে নেই ফেসবুকে। ২০১৭ সালের এপ্রিলের জরিপ অনুযায়ী, ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ সক্রিয়ভাবে ফেসবুক ব্যবহার করছে। (সূত্র: দৈনিক বণিক বার্তা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭)।

বিশ্বব্যাপী ইউটিউব ব্যবহারকারী ১৫০ কোটি, হোয়াটসঅ্যাপ ১২০ কোটি, ফেসবুক মেসেঞ্জার ১২০ কোটি ও উইচ্যাট ব্যবহারকারী ৯৩ কোটি ৮০ লাখ (আগস্ট ২০১৭, সূত্র: ইন্টারনেট)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব: ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বর্তমানে মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব রেখে চলেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে দিচ্ছে ফেসবুক। ফেসবুক-জাদুতে দূর হয়েছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। ফেসবুকের মাধ্যমে এর সদস্যরা নির্দিষ্ট কাউকে বন্ধু হিসেবে বেছে নিতে পারেন। আবার কারও বন্ধুত্বের আহ্বান ফিরিয়েও দিতে পারেন।

ফেসবুকের মাধ্যমে শেয়ার করা ছবি, ভিডিও, মতামত ইত্যাদির ওপর মন্তব্য করা যায়। আবার চলে পালটা মন্তব্য। ব্যক্তিগত বার্তা পাঠানো যায়, যা কেবল যাকে পাঠানো হয় সে-ই পড়তে ও দেখতে পারে, অন্যরা নয়। তাছাড়া নতুন বা পরিচিত বন্ধু খোঁজার জন্য ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক রয়েছে। নিজের পছন্দ অনুযায়ী গ্রুপ করে নেওয়া যায়। ফেসবুকের সবচেয়ে মজার জিনিসটি হচ্ছে আলাপচারিতা (Chatting)। কাঙ্ক্ষিত বন্ধুটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ফেসবুকে থাকা সাপেক্ষে তার সঙ্গে আলাপ করা যায়।

সংবাদের ক্ষেত্রে প্রভাব: বর্তমানে সংবাদের জন্য মানুষের সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের ওপর নির্ভরতা আগের তুলনায় অনেকগুণ কমেছে। ২০১১ সালে Pew Research Data থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮০ শতাংশ লোক সংবাদের জন্য অনলাইনের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সংবাদ জেনে যায়। সিএনএন পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, তিন-চতুর্থাংশ মার্কিন নাগরিক ইমেইল অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সংবাদ পেয়ে থাকে। মার্কিন তরুণদের ক্ষুদ্র একটি অংশ শুধু মাঝেমধ্যে সংবাদপত্র পড়ে। এর শতকরা হার ১০ ভাগেরও কম।

কিশোর-কিশোরীদের ওপর প্রভাব: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটা ভয়ংকর ক্ষতিকর দিক হলো কিশোর-কিশোরীদের কাছে পর্ন সাইট উন্মুক্ত হয়ে পড়া। সহজেই তারা বয়স্কদের সাইটে ঢুকতে পারে, যা তাদের অপরিপক্ব মানসিকতায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। সাংবাদিক সাঈদ সরকার এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে তরুণ ও কিশোর সমাজের। সুস্থভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কায়িক শ্রমের গুরুত্ব রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করার। কিন্তু ফেসবুকের মায়ায় প্রায়ই আটকে পড়ছে তরুণ ও কিশোর সমাজ। লেখাপড়া, কোচিং, প্রাইভেট, টিভি দেখা ইত্যাদি কারণে সময় বের করা এমনিতেই ক্ষীণ। তারপরও যেটুকু পাওয়া যায়, তা-ও কেড়ে নিচ্ছে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। হাতে হাতে এখন আইফোন, স্মার্টফোন। যখন তাদের ভবিষ্যতে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখার কথা, তখন তারা ভাবছে ফেসবুকে কত আকর্ষণীয় ছবি আপলোড করা যায়। অথবা এমন কী কথা লেখা যাবে যাতে লাইক, শোয়ারের বন্যা বয়ে যাবে। এতে বুদ্ধির বন্ধ্যত্ব তৈরি হচ্ছে, বিঘ্নিত হচ্ছে মেধার বিকাশ।'

সামাজিক বৈষম্য তৈরি: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সমাজে ধনী-দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান তৈরি করে। হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনসাধারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুবিধা গ্রহণ করতে অক্ষম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তিতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও ধনী-দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে। যাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা আছে, তারা চাকরি, প্রভাবশালীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং নিজ এলাকায় সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বেশি পেয়ে থাকে।

আসক্তি তৈরি করা: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে একধরনের আসক্তি তৈরি হয়। অধিক সময় ব্যয় হয়, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং যৌন আলাপচারিতা বেশি হয়। এসব কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের বিকারগ্রস্ত করে তোলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মানসিক চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে অনেক ক্লিনিক গড়ে উঠেছে। একজন ইংরেজ মনোচিকিৎসক বলেছেন, তিনি বছরে প্রায় ১০০ জনকে মনোচিকিৎসা দিচ্ছেন, যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ফলে মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

চাকরি ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব: কোনো তরুণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপত্তিকর ছবি পোস্ট করলে চাকরিক্ষেত্রে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ২০১৩ সালে ৬টি দেশের ১৭ হাজার তরুণের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১৬-৩৪ বছর বয়সি তরুণের ১০ জনের মধ্যে ১ জন চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য। ২০১৪ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৯৩ শতাংশ নিয়োগদাতা প্রার্থী বাছাইয়ের সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের পোস্টিং পরীক্ষা করে দেখেন। বেলজিয়ামের Ghent University-র Professor Stijn Baert এক জরিপে দেখিয়েছেন, ফেসবুকে যাদের প্রফাইল ছবি বিতর্কিত, তারা নিয়োগ পরীক্ষার জন্য ডাক পাননি। নিয়োগকারী সংস্থা অনেক সময় চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে পাসওয়ার্ড নিয়ে ফেসবুক পরীক্ষা করেন।

কলেজে ভর্তি: ছাত্র-ছাত্রীদের ফেসবুক কমেন্ট, পোস্টিং কোনো কলেজের নীতিমালা বা মূল্যবোধের পরিপন্থি হলে সে কলেজে সে ভর্তির সুযোগ পাবে না। আগে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, রিপোর্ট কার্ড, পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কার্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনা করা হতো ভর্তির সময়। এখন সময় বদলেছে, পশ্চিমা বিশ্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্র ভর্তির সময় ভর্তীচ্ছুদের ফেসবুক প্রোফাইল পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আমাদের দেশেও অদূরভবিষ্যতে এরকম ভর্তি পদ্ধতি শুরু হবে আশা করা যায়।

জঙ্গি সংগঠনগুলো কর্তৃক ব্যবহার: জঙ্গি সংগঠগুলো তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিজেদের সংগঠিত করার কাজে ব্যাপকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার করে থাকে। আইএস তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তরুণদের তাদের সংগঠনে রিক্রুট করার কাজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্য নিচ্ছে। তাদের রয়েছে অনলাইন ম্যাগাজিন Islamic State Report. তারা অনেক অনলাইন মেটেরিয়াল তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দেয়। এভাবে তারা তরুণদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। অনেক তরুণ-তরুণী তাদের অনলাইন বক্তব্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে গোপনে দেশ ত্যাগ করেছে।

২০১৩ সালে আমাদের দেশে রামুতে বৌদ্ধমন্দিরে হামলা, বৌদ্ধদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক হামলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ২০১৭ সালে নভেম্বরে রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় হামলা ও হতাহতের ঘটনায় ছিল দুর্বৃত্তকর্তৃক ফেসবুকের অপব্যবহার। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে এ ধরনের অপকর্ম সংঘটিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গবেষণা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর আগে এর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ওপর গবেষণা করা হয়। এ গবেষণায় দেখা গেছে, ফেসবুকের কারণে অনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পক্ষে মত দিয়েছেন সব শিক্ষক এবং তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী। ফেসবুকে নগ্ন ছবি/ভিডিও ছেড়ে দেওয়া হয়, নারীদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করা হয় এবং স্পর্শকাতর বিষয়ে অপপ্রচার চালানো হয়। মতাদর্শগত পৃথক গ্রুপগুলো ফেসবুকের মাধ্যমে একে অপরকে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।

এ গবেষণায় এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী ও প্রায় অর্ধেক শিক্ষকের মতে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে ফেসবুকের প্রভাব রয়েছে। ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মতে দূরের অত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে ফেসবুকের প্রভাব রয়েছে। আবার মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি, যৌন ব্যবসায়, সামাজিকভাবে কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করা এবং ব্যক্তিগত ক্রোধের কারণে কাউকে ঝামেলায় ফেলার মতো প্রভাবও রয়েছে ফেসবুকের। জনমত গঠনে ও সচেতনতা সৃষ্টিতে ফেসবুকের প্রভাব রয়েছে। ফেসবুকের মাধ্যমে কেউ কেউ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন বলেও গবেষণায় জানা যায়। শিক্ষাক্রমে ফেসবুকের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই রয়েছে।

সুপারিশ: ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য গবেষণায় কতগুলো সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– অনৈতিক কাজ বন্ধ করার জন্য অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটি বৃদ্ধি করা, অশালীন ছবি ও তথ্য সম্পর্কে একটা শালীন নীতিমালা প্রণয়ন করা, ব্যবহারকারীদের নীতি ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা এবং ফেসবুকের নেতিবাচক দিক বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। নারীদের হেয়প্রতিপন্ন করে এরকম গ্রুপগুলো চিহ্নিত করে এ অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করার উদ্যোগের সুপারিশও করা হয়েছে গবেষণায়। বিনোদন লাভের জন্য অনেক শিক্ষার্থী ফেসবুক ব্যবহার করে। বিনোদনের নামে কেউ যেন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে না পড়ে, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা কী পরিমাণ সময় ব্যয় করছে ফেসবুকে, পর্ন সাইট ভিজিট করছে কি না, পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে কি না, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. ইন্টারনেট
২. ডিজিটাল বিশ্বে ফেসবুক: বাংলাদেশে ফেসবুকের সামাজিক প্রভাব –মো. ছেরাজুল মোস্তাহেদিন, মাসুমা আক্তার ও এনামুর রহমান সাগর। নিরীক্ষা: অক্টোবর ২০১১-জুন ২০১২
৩. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সংবাদপত্র –নাসিমূল আহসান, নিরীক্ষা, এপ্রিল-জুন ২০১৫
৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে দিকগুলো ভাবায় –সাঈদ সরকার, দৈনিক বণিক বার্তা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭

লেখক: সহকারী পরিচালক, আইএসপিআর

প্রবীণের অধিকার টেকসই উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের ভূমিকা

ডা. মহসিন কবির

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি, সচেতনতা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, মৃত্যুহার হ্রাসের কারণে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। ফলে বিশ্বজুড়েই বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা আকস্মিক হারে বাড়ছে। আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোয় আনুপাতিক হারে প্রবীণদের সংখ্যা বেশি হলেও এশিয়া অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি প্রবীণের বসবাস। এখনই সময় সম্ভাব্য প্রবীণ সমস্যা সমাধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করার। সেক্ষেত্রে সবার আগে এগিয়ে আসা দরকার দেশের তরুণ প্রজন্মের। কেননা আজ যারা বয়সে তরুণ, তারাই আগামী দিনের প্রবীণ।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, শিল্পোন্নত দেশগুলোর ৬৫ বছর বয়স বা তদূর্ধ্ব বয়সি ব্যক্তিকে প্রবীণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ঘোষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের যেসব নাগরিকের বয়স ষাট (৬০) বছর বা তার বেশি, সেসব ব্যক্তিকে প্রবীণ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের প্রবীণ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির যে উল্লম্ফন দেখা দিয়েছে, তার মোকাবিলা করা হয়ে ওঠবে এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। এখনই প্রস্তুতি না নিলে দেশে টেকসই উন্নয়নের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা হুমকির মুখে পড়বে।

বাংলাদেশের ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকার দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ প্রবীণ ... অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার প্রায় ১ হাজার ৮৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে

বাংলাদেশে প্রবীণদের অবস্থা

বাংলাদেশেও কয়েক দশক ধরে জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দেড় কোটি প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন রয়েছেন। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে প্রবীণের সংখ্যা প্রতিবছর ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ হারে বাড়ছে। দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই বয়স্ক মানুষকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেননা বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ

সক্ষম মানুষ হলেও ২০৪৭ সালের পর থেকে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

বর্তমানে ভাতা ও পেনশন মিলিয়ে প্রবীণ জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ সরকারি সহায়তা পায়। বাকি ৬৯ শতাংশ কোনো অর্থ সহায়তা পায় না, যার মধ্যে ২৭ শতাংশ বয়স্কভাতা এবং ৪ শতাংশ সরকারের পেনশন পায়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে, বয়স্কদের মৃত্যুহার একদিকে যেমন কমেছে, অন্যদিকে গড় আয়ুও বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০৩০ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ হবে প্রবীণ। ২০৪৪ সালে যা কম বয়সি জনগোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে যাবে।

গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে ২০৫০ সালে শিশুর চেয়ে প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা এক শতাংশ বেশি হবে। ওই সময়ে শিশুর সংখ্যা হবে ১৯ শতাংশ এবং প্রবীণ নাগরিক ২০ শতাংশ।

২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রবীণের সংখ্যা হবে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ। ২০৫০ সালে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি এবং ২০৬১ সালে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি প্রবীণ জনগোষ্ঠী হবে।

প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণে সরকারের নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বর্তমান সরকার। সরকার বয়স্কভাতা কর্মসূচি চালুর পাশাপাশি পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ প্রণয়ন করেছে এবং জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া প্রবীণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিটি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের মাধ্যমে প্রবীণদের কর্মসূচি আরও গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকার দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ প্রবীণ নাগরিকের জন্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বয়স্ক ভাতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার প্রায় ১ হাজার ৮৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রথমবার ৪ লাখ ৩ হাজার ১১১ জনকে মাসে ১০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেয় সরকার। বর্তমানে এই ভাতা পাচ্ছেন সাড়ে ৩১ লাখ প্রবীণ ব্যক্তি। ভাতার হার মাসে ৫০০ টাকা। ন্যূনতম ৬৫ বছর বয়সি পুরুষ ও ৬২ বছর বয়সি নারী এ ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। একটি জরিপে দেখা গেছে, বয়স্কভাতা পাওয়ার কথা নয় এমন ৩৩ শতাংশ ব্যক্তি পেয়েছেন। আবার মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের জরিপে দেখা গেছে, এ হার ৩০ শতাংশ। যাদের সত্যি প্রয়োজন, তারা যেন ভাতা পান, সে বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও প্রবীণ

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা যে রকম পৃথিবী তৈরি করে দিয়ে যেতে চাই, তা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় প্রবীণ ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী যে কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে। বর্তমানে আগের থেকে মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি বড়ো অংশজুড়ে রয়েছেন প্রবীণজন। ২০৫০ সালের মধ্যে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে জনসংখ্যার জনমিতিতে প্রবীণের প্রভাব হয়ে উঠবে লক্ষণীয়।

প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, তাদের দৈনন্দিন চলাফেরা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় ২০২০-২০৩০ এর দশকে নানা ক্ষেত্রবিশেষে বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি।

বিশ্বজুড়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) যেসব অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে প্রবীণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

প্রবীণ জনগোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে যেমন খাদ্য উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে, তেমনি তারাই খাদ্য নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এটা যে শুধু প্রবীণ বয়সে বেশি খাদ্য পুষ্টির দরকার পড়ে, তার জন্য নয়। বরং আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে শিশু ও নারীকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রবীণ বয়সে তাদের সেবাযত্ন পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যের ওপর নির্ভরতা করতে হয়, তার মাত্রা কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩: সব বয়সি সব মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

ক্রমবর্ধমান বয়স্ক মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা ব্যতিরেকে এসডিজির অভীষ্ট-৩ এর সব বয়সি সব মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ করা সম্ভব হবে না। সবার জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ওষুধ ও টিকা সুবিধাপ্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বয়স্কদের চিকিৎসাসেবার বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে প্রবীণ বয়সে সুস্থ থাকতে ও বাত-ব্যথামুক্ত থাকতে সবচেয়ে কার্যকরী হচ্ছে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা পদ্ধতি, জেলা-উপজেলাসহ প্রবীণদের স্বাস্থ্য খাতের সব ক্ষেত্রে সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। জীবনের সব পর্যায়ে স্বাস্থ্য ভালো রাখার যে সুযোগ আছে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবার খরচ হ্রাস করার পাশাপাশি তাদের চিকিৎসাসেবার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে। সমাজে প্রবীণদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণও বৃদ্ধি করতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪: সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ এবং নিজেকে সমৃদ্ধি করার পথ যেন সবসময় উন্মুক্ত থাকে। বয়স্কদের তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বয়স্ক বয়সে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাগত সুযোগগুলোয় অব্যাহত অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। যাতে তারা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আরও ভালো রাখতে পারে, নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদেরও সম্পৃক্ততা বাড়াতে পারে, বয়স বৃদ্ধির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা (যেমন– অবসর, বিধবা, বিপত্নীক), তাদের পরিচয়, সামাজিক যোগাযোগ বজায় রেখে জীবনের প্রতি আগ্রহী থাকতে পারে এবং বর্তমান তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। এগুলো নিশ্চিত করতে পারলে তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সমাজে আত্মমর্যাদা নিয়ে থাকতে পারবে এবং দেশ গঠনে তাদের মেধা-মননকে কাজে লাগাতে পারবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন

নারী পুরুষের চেয়ে গড়ে বেশি সময় বাঁচেন। সে হিসাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি জনসংখ্যার মধ্যে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী নারীর সংখ্যা ছিল ৫৪ শতাংশ। নারী পরিবারে শিশুর লালনপালন থেকে শুরু পরিবারের অন্যাদের যত্ন নিয়ে থাকে। যদিও তাদের এ কাজকে আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। প্রবীণ নারী জীবন সায়াহ্নে অনেক নেতিবাচক পরিণতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। সমাজে মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পরিবারের বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

এছাড়া জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে প্রবীণ নারী আরও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮

সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি ও স্থিতিশীলতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। দরিদ্রতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দারিদ্র্যমুক্ত প্রবীণের সুস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– গ্রহণযোগ্য অবসর ভাতা, ট্যাক্স ফান্ডেড মিনিমাম পেনশন, বয়স্ক কর্মজীবীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবী শিক্ষার প্রচলন যাতে করে তারা সমাজে কাজ করার আরও সুযোগ পায়। প্রবীণের অধিকার ও কল্যাণের জন্য তাদের পছন্দের ও উপযোগী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তার নিজের ও পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৯
অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ, এক্ষেত্রে আমরা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১১
অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা, এক্ষেত্রেও আমরা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬
টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।

বিশ্বে প্রবীণদের অবস্থা ও প্রবীণ দিবস
বর্তমান বিশ্বে ৭০ কোটিরও অধিক ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ বসবাস করছেন, যা ২০৫০ সালের মধ্যে ২০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে মত দিয়েছেন জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা। এর ৮০ শতাংশই হবেন উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী। আর প্রবীণের সংখ্যা জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হবে। এ জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশ বার্ধক্যবিষয়ক সমস্যা মোকাবিলার ঝুঁকিতে রয়েছে।

১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় প্রতিবছর এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রবীণদের সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্যের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে এ দিবসটি পালন করা শুরু হয়।

বাংলাদেশে ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত বার্ধক্য বা প্রবীণদের ব্যাপারে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা বা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অর্থাৎ গত শতাব্দীতে প্রবীণদের সমস্যা নিয়ে করা কিছু গবেষণার আলোকে এ বিষয়টি নিয়ে জনগণ থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চপর্যায়ে গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। আমরা যদি আগামী দিনে আমাদের দেশকে প্রবীণবান্ধব হিসেবে দেখতে চাই, তবে এখন থেকেই কর্মপরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গণমাধ্যমে বা মিডিয়ায় প্রবীণদের উপস্থাপন
প্রবীণদের নিয়ে কাজ বলতে গেলে আমাদের দেশের মিডিয়াগুলো মূলত দিবসভিত্তিক হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস (১লা অক্টোবর) পালন ও বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর করা বিভিন্ন সমীক্ষার ফল নিয়ে কিছু প্রতিবেদন ছাড়া প্রবীণদের নিয়ে বলার মতো কোনো কাজ করতে খুব একটা দেখা যায় না। আর যদিও কোনো মিডিয়া বা গণমাধ্যম কিছু করে থাকে তবে এর পরিমাণ খুবই নগণ্য। প্রবীণ দিবস নিয়ে 'আজ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস', 'বিশ্ব প্রবীণ দিবস আজ', 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেই নিজেদের দায়সারা দায়িত্ব পালন করে দেশের প্রথমসারির পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো। আবার বিভিন্ন সময়ে তারা কিছু প্রোগ্রামের আয়োজন করলেও তাতে প্রবীণদের অসহায়ত্বের বিষয়গুলো ফলাও করে প্রচার করে থাকে। এসব বিষয় ছাড়াও প্রবীণ জনগোষ্ঠী যে একটি দেশের সম্পদ হিসেবেও কাজে লাগতে পারে, এ নিয়ে কোনো ধরনের আয়োজন করতে দেখা যায় না।

প্রবীণ হওয়া মানুষের জীবনের একটা স্বাভাবিক পরিণতি। আজ আমরা যারা নবীন ও তরুণ, সময়ের আবর্তে একদিন আমরাও প্রবীণ হব। তাই প্রবীণদের নিরাপদ, স্বস্তিময় ও সুন্দর বার্ধক্য নিশ্চিত করতে দেশের মিডিয়াগুলো যেসব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজটি করতে পারে, তা আলোকপাত করা হলো:

* জাতীয় বাজেটে প্রবীণদের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে
* জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে প্রবীণদের জন্য স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে
* বাস-ট্রেন ও নৌপথে চলাচলের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে
* জাতীয় পরিচয়পত্রের মতো প্রবীণদের জন্য আলাদা পরিচয়পত্র দেওয়া এবং ভবিষ্যতে প্রবীণবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের বিষয়ে
* প্রবীণদের জন্য প্রবীণ নিবাস, ডে-কেয়ার সেন্টারসহ বিভিন্ন সুযোগের বিষয়ে
* কর্মক্ষম প্রবীণদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার বিষয়ে
* প্রবীণ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর নিমিত্তে গণমাধ্যমে সভা-সেমিনার, আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে
* স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোয় বিভিন্ন পাঠ্যতালিকায় বার্ধক্য ও প্রবীণজীবন বিষয়টি সংযুক্ত করার বিষয়ে
* প্রবীণদের পাঠ্যপুস্তকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন এবং প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩, পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩, সিনিয়র সিটিজেন বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা।

বাংলাদেশের গড় আয় বাড়ার সঙ্গে গড় আয়ু বাড়ছে। সেই সঙ্গে যৌথ পরিবার ভেঙে এক দম্পতি বা একক পরিবারের আদর্শ জনপ্রিয় হওয়ায় প্রবীণদের মধ্যে নিঃসঙ্গ ও পরিবারহীন হওয়ার হারও বাড়ছে। এ বাস্তবতায় প্রবীণদের বার্ধক্যকালীন জীবন সুগম করতে রাষ্ট্র বা সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের যে মানুষ প্রবীণ হচ্ছে, তারা একপ্রকার মানবেতর দিন কাটাচ্ছে, বাড়ছে পথপ্রবীণের সংখ্যা। প্রবীণদের জীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা আনতে আমাদের পারিপার্শ্বিক ও সামগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে প্রবীণের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বার্ধক্যকালীন সম্ভাব্য যেসব সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রবীণদের বৃহত্তর স্বার্থে অর্থাৎ প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। পরিশেষে আমি আশা করি, আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারবে প্রবীণবান্ধব বাংলাদেশ গড়তে।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, প্রবীণ বন্ধু ফাউন্ডেশন

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সংঘাত সংবেদনশীল সাংবাদিকতা: প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা

রাহাত মিনহাজ

জগৎসংসার দ্বন্দ্বমুখর। দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছাড়া পৃথিবী অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই নানা রকম দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি বিরাজমান, যা থেকে ঘটছে সংঘাত-সহিংসতা, প্রাণহানি। বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশকে ১১-১২ লাখ রোহিঙ্গাকে নিয়ে এক বিশেষ দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। যার পেছনে আছে রাখাইনে জাতিগত সংঘাত-সহিংসতার এক দীর্ঘ ইতিহাস। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়ায় চলছে বহুমুখী দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। কয়েক বছর ধরে টানা গৃহযুদ্ধ চলছে দেশটিতে। সংঘাত চলছে ইয়েমেনে। এসব দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এতটাই জটিল সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে অনেক সময় বিশ্ব গণমাধ্যমও খেই হারিয়ে ফেলে কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সেই বিষয়টি নিশ্চিত হতে। বর্তমান সময়ের আলোচিত তাত্ত্বিক ম্যাক্স লুকাডো (Max Lucado) যুদ্ধ ও সংঘাত সম্পর্কে বলেছেন, `Conflict is inevitable, but combat is optional`. লুকাডোর এই কথাটি সত্যিই ভাবনার উদ্রেক করে। বিশ্ব ব্যবস্থায় পুরোপুরি দ্বন্দ্ব নিরসন সত্যিই কঠিন, তবে যুদ্ধ করাটা ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

> *যুদ্ধ শুধু রণাঙ্গনেই হয় না, যুদ্ধের আরেকটি বড়ো ক্ষেত্র হলো গণমাধ্যম। ... প্রভাবশালী দেশগুলো ভুল তথ্য ব্যবহার করে, মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে যুদ্ধ জয় করে*

যুদ্ধে প্রথম নিহত হয় সত্য (The first casualty of War is Truth):

যুদ্ধ শুধু রণাঙ্গনেই হয় না, যুদ্ধের আরেকটি বড়ো ক্ষেত্র হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশিত তথ্যের দ্বারা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। অনেক সময় প্রভাবশালী দেশগুলো ভুল তথ্য ব্যবহার করে, মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে যুদ্ধ জয় করে। তাই অবধারিতভাবেই বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের অন্যতম প্রয়োজনীয় অস্ত্র হলো তথ্য (Information). আর যুদ্ধকালীন সময়ে তথ্য বা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নিয়ে চলে নানা রকম রাজনীতি, কূটনীতি বা সমরনীতি। যার চাপে পড়ে প্রথমেই যে প্রাণ হারায় সে হলো 'সত্য'। যাকে তাত্ত্বিকরা ব্যাখ্যা করেছেন 'The first casualty of War is Truth' এই শব্দযুগলের মাধ্যমে।

'The first casualty of War is Truth' শব্দযুগল প্রথম ব্যবহার করেন হিরাম ওয়ারেন জনসন (Hiram Warren Johnson). ক্যালিফোর্নিয়ার এই সিনেটর ১৯১৭ সালের প্রথম এই বাক্যটি ব্যবহার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কারণ যুদ্ধকালীন তথ্যের নানাবিধ অপব্যবহার নিয়ে সবাই অবগত ছিলেন কিন্তু জনসনের আগে যুদ্ধ ও সত্য সম্পর্কে এমন নির্জলা সত্য কেউ উচ্চারণ করেননি। সাম্প্রতিক সময়ে নানা ঘটনাপ্রবাহে জনসনের কালজয়ী এই উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন: মিয়ানমারের রাখাইনের সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজমান। যার সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব সহ্য করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। রাখাইনে ২০১৭ সালের শেষদিক থেকেই এক ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি। এই যুদ্ধে মূলত দুটো পক্ষ। ক. মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও প্রশাসন, খ. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। চলমান এই সংঘাতে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র সংগঠন আরসা'র (ARSA:Arakan Rohingya Salvation Army) উসকানিমূলক আক্রমণ কতটা সত্য, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিপীড়ন কতটা সত্য তা নিয়ে চলছে পালটাপালটি যুক্তিতর্ক। এরপর রোহিঙ্গাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, হত্যাকাণ্ড, দেশত্যাগে বাধ্য করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে চলছে নানা রকম দাবি আর পালটা দাবি। হিরাম ওয়ারেন জনসনের ভাষায় বলা যায়, এখানে প্রথম নিহত হয়েছে 'সত্য'।

তবে ভুলে গেলে চলবে না সত্যই (Truth) সাংবাদিকতার মূল শক্তি। সত্যকে উদ্‌ঘাটন এবং তা তুলে ধরাই সাংবাদিকের মূল দায়িত্ব। আর কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই সত্যের আলোকে সাংবাদিককে পালন করতে হয় আরও গুরুদায়িত্ব। এ সময় একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিককে পুরো ঘটনাকে মানবিকীকরণ (humanize) প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে হয়। যার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় সবার অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি। এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমে অমানবিকীকরণ (De-humanize) খুবই ভয়ংকর হতে পারে। যা উসকে দিতে পারে গণহত্যার মতো ভয়ংকর অপরাধ। যেমন: রুয়ান্ডা গণহত্যা (১৯৯০-১৯৯৪)। যাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৫ থেকে ১০ লক্ষ তুতসী। এই গণহত্যা সাধারণত তুতসী জনগোষ্ঠী গণহত্যা নামেও পরিচিত। রুয়ান্ডাতে এই জাতিগত নিধনের সময় ফরাসি ভাষার সাময়িকী 'কানগুরা'তে তুতসীদের লক্ষ করে প্রকাশ করা হয় ঘৃণা প্রকাশক অনেক প্রতিবেদন। যাতে তাদেরকে চিত্রিত করা হয় 'তেলাপোকা' ও 'সাপ' হিসেবে। অন্যদিকে রুয়ান্ডার রেডিও (RTLM- Radio Television Libre des Mille Collines) উন্মাদনা ছড়িয়ে গণহত্যা সংঘটিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই রেডিও বারবার বিভিন্নভাবে ঘোষণা করা হয় তুতসীরা তেলাপোকা (cockroaches)। তাদের হত্যা করা একান্ত কর্তব্য। এই রেডিও'তে ১২ এপ্রিল ১৯৯৪ সালে সম্প্রচারিত এক বার্তায় হুতু জেনারেল কানটানো হাবিমানা (Kantano Habimana) বলেন, 'And you people who live... near Rugunga... go out. You will see the cock-roaches' (inkotanyi) straw huts in the marsh... I think that those who have guns should immediately go to these cockroaches... encircle them and kill them ...' কি ভয়ংকর উচ্চারণ। যা নিশ্চিতভাবেই ত্বরান্বিত করেছিল ভয়ংকর এক গণহত্যা।

এমন বাস্তবতায় সারা বিশ্বে সংঘাত সংবেদনশীল সাংবাদিকতা Conflict Sensitive Journalism নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ চলছে। গণমাধ্যম যাতে কোনোভাবেই কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতিকে উসকে দিয়ে আরও ধ্বংস ডেকে না আনে সেজন্য চলছে নানা ধরনের একাডেমিক আলোচনা। এমনই একটি আলোচনা করেছেন গবেষক রস হাওয়ার্ড (Ross Howard). তিনি তার 'Conflict sensitive journalism' handbook-এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সঠিক সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সেগুলো হলো:

ক. সঠিকতা বজায় রাখা (Accuracy): সঠিকতা সাংবাদিকতার বড়ো সম্পদ। কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত তথ্যের চেয়ে তথ্য না দেওয়া ভালো। বলা হয়, A good journalist will rush to get the news first. But first, the journalist must get it right. অর্থাৎ একজন ভালো সাংবাদিক সবার আগে সংবাদ সংগ্রহ বা পাওয়ার চেষ্টা করেন, তবে প্রথমেই সাংবাদিককে ঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যদি তা না হয় তাহলে বড়ো ধরনের ভুল হতে পারে। যেমন: প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯০-৯১) অপারেশন ডেজার্ট স্ট্রমের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী বাগদাদের একটি কারখানায় হামলা চালায়। ওই হামলা চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে এটি ছিল একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা। কিন্তু পরে জানা যায়, এটি ছিল শিশুদের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি কারখানা। অনেক গণমাধ্যম যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সরবরাহকৃত সংবাদটি প্রচার বা প্রকাশ করে। যা ছিল মিথ্যা। এই মিথ্যার মাধ্যমে শিশুদের জন্য খুবই জরুরি একটি কারখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল; কিন্তু তারপরও জনমত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে।

খ. নিরপেক্ষতা বজার রাখা (Impartiality): প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে কারও পক্ষ নেওয়া সাংবাদিকের কাজ নয়। সাংবাদিককে অবশ্যই তাঁর জাতীয়তা, জাত, ভালোলাগা, মন্দলাগার ঊর্ধ্বে ওঠে নিরপেক্ষতার সাথে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করতে হবে। এখানে কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ নেই। সংবাদ হতে হবে নিরপেক্ষ। বস্তুনিষ্ঠ। মনে রাখতে হবে Journalist এর Activist হওয়ার সুযোগ নেই। যেমন: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল। শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ১০-১৫ বছর এক ধরনের শান্তির পরিবেশ বিরাজ করে। কিন্তু সম্প্রতি আবার পাহাড় অশান্ত হয়ে ওঠছে। এখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সমতলে অবস্থিত এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি। তাই প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সমতল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি এক ধরনের পক্ষপাত চলে আসতে পারে। যা থেকে বিরত থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরাই সাংবাদিকের কর্তব্য।

গ. দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা (Responsibility): যুদ্ধ-সংঘাত পরিস্থিতিতে একজন সাংবাদিক হবেন দায়িত্বশীল। সংবাদ হবে বস্তুনিষ্ঠ। মনে রাখা ভালা, একজন চিকিৎসকের হাতে ছুরি আর একজন ছিনতাইকারীর হাতের ছুরির ব্যবহার এক নয়। চিকিৎসক প্রাণ বাঁচাতে ছুরি ব্যবহার করেন। আর ছিনতাইকারী অন্যের প্রাণ হরণ করতে। তাই মনে রাখতে হবে, একজন অপপ্রচারকারীর (Propagandist) কাছেও যেমন তথ্য থাকে, তেমনি একজন সাংবাদিকও (Journalist) নানা উৎস থেকে তথ্য পেয়ে থাকেন। পার্থক্য শুধু তথ্য ব্যবহারের ধরনে। কীভাবে সাংবাদিক তথ্য ব্যবহার করে উত্তেজিত পরিস্থিতিকে শান্ত করার চেষ্টা করবেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, উসকানি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা (Reliable journalism): মনে রাখতে হবে, বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বড়ো বিষয়। একজন পাঠক সেই পত্রিকাই বাড়িতে রাখেন, যে পত্রিকার সংবাদ তিনি বিশ্বাস করেন। দায়িত্বশীলতার মাধ্যমেই এই দায়িত্বশীলতা অর্জন করতে হয়। ২০০১ সালে ইরাক যুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের বিবিসি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিএনএনের অনেক ইস্যুতে তাদের প্রতি মুসলিম বিশ্বের দর্শকরা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল। যে শূন্যস্থান দখল করে নেয় নতুন চ্যানেল আলজাজিরা (অর্থ উপদ্বীপ)। যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বকালীন সময় বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন খুবই জরুরি। যা অর্জন সম্ভব দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে। রস হাওয়ার্ড (Ross Howard) বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা (Reliable journalism) ক্ষেত্রে একটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। যা অনেকটা এ রকম:

ঠিক তথ্য + নিরপেক্ষতা + দায়িত্বশীলতা = বিশ্বাসযোগ্যতা

Accuracy + Impartiality + Responsibility = Reliability

সংঘাত বুঝুন, সহমর্মিতা নয়: জেন সিয়েটন

জেন সিয়েটন (Jean Seaton) যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া হিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি গণমাধ্যম নিয়ে নানা ধরনের গবেষণায় যুক্ত। তিনি War and the Media. Reporting Conflict ২৪/৭ (২০০৩) বইয়ে 'Understanding for Empathy' চ্যাপ্টারে (পৃষ্ঠা ৪৫-৫৪) যুদ্ধ সময়ের সাংবাদিকতা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি যুদ্ধদিনের সাংবাদিকতার স্বরূপ নির্ধারণে বলেছেন:

'News is one of the great political and artistic forms animating contemporary collective and private lives and it deals with how we understand our condition. Violent news can be awe some and its bitter sights addictive.' অর্থাৎ সংবাদ হয় এক ধরনের অসাধারণ রাজনৈতিক ও নান্দনিক কাঠামো যার মাধ্যমে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবন প্রভাবিত হতে পারে। সংবাদ সাধারণত আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে সহযোগিতা করে। সংঘাত-সহিংসতার সংবাদ খুবই ভালো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটা এক ধরনের আসক্তি।

নিকোলাস নুজেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি (Nicholas Nugent Outlook)

নিকোলাস নুজেন্ট একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক, প্রশিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন বিবিসি'তে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখান থেকে এডিটর পদে অবসর নেওয়ার পর তিনি বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করে আসছেন। ভূমিকা রাখছেন পরামর্শক হিসেবে। নিকোলাসের আগ্রহের বিষয় Conflict Sensitive Journalism. পেশাগত জীবনে তিনি নিজে যেমন বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব সংকুল ঘটনাপ্রবাহ কাভার করেছেন আবার জ্যেষ্ঠ সংবাদকর্মী হিসেবে তিনি বিবিসিতে চাকরির সময় অন্যান্য সাংবাদিকদের এ বিষয়ে সফল হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন।

২০১৮ সালের মে মাসে নিকোলাস বাংলাদেশের বিএনএনআরসি (বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশনস) ও ইন্টারনিউজের আয়োজনে Conflict Sensitive Journalism নিয়ে একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন। দুইদিনের ওই কর্মশালায় তিনি এ বিষয়ে নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনা গবেষক হাওয়ার্ডের আলোচনার সাথে অনেকটা সংগতিপূর্ণ।

এছাড়াও নিকোলাস আরও কয়েকটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব দেন। সেগুলো হলো :

ক. মূল্যবোধ (Values)
খ. শব্দচয়ন (Vocabulary)
গ. পক্ষপাতিত্ব (Bias)
ঘ. নিরাপত্তা (Safety)

এছাড়া Conflict Sensitive Journalism- এ আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করেন নিকোলাস।

কারও ক্ষতি না করা (Do not Harm):

যুদ্ধ বা সংঘাতকালীন সাংবাদিকতাতে এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, সংঘাতকালীন কোনো সাংবাদিকের প্রতিবেদন যাতে কোনো অবস্থাতেই অন্য কারও ক্ষতি না করে। আর ভিকটিম বা যিনি অপরাধের শিকার তাঁর সুরক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। নিকোলাস নুজেন্ট ওই কর্মশালায় বারবার উল্লেখ করেছেন যুদ্ধ বা সংঘাতকালীন সময় অবশ্যই যিনি সাক্ষাৎকার বা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করছেন তাঁর প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। তাঁর নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকারদাতার জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়।

তথ্যসূত্র

* http://www.newtimes.co.rw/section/read/73836
* Kisnan, Daya, Freeman, Des, (2003) War and the Media. Reporting Conflict 24/7, Delhi: Vistaar Publications.

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

কালরাত্রির কালো উপাখ্যান

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

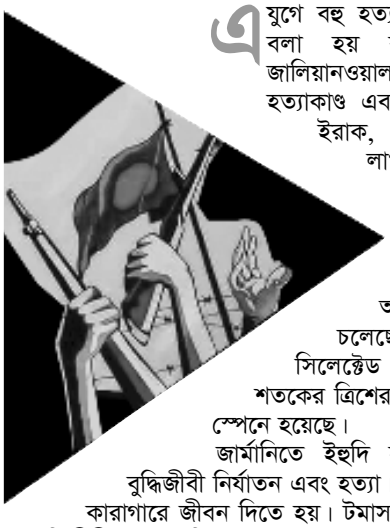

এযুগে বহু হত্যাকাণ্ড হয়েছে। যেগুলোকে বলা হয় বর্বর গণহত্যা। যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগ, শার্পভিল, মাইলাই হত্যাকাণ্ড এবং অন্যায় ও অবৈধ যুদ্ধে ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে লাখ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা। যাদের সংখ্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো দেশে চলেছে গণহত্যার পাশাপাশি সিলেক্টেড কিলিং। যেমন- গত শতকের ত্রিশের দশকে জার্মানি, ইতালি ও স্পেনে হয়েছে।

জার্মানিতে ইহুদি হত্যার পাশাপাশি চলেছে বুদ্ধিজীবী নির্যাতন এবং হত্যা। রোমা রোঁলাকে হিটলারের কারাগারে জীবন দিতে হয়। টমাসম্যানসহ অসংখ্য সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। ইতালিতে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দলের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য আগে বিখ্যাত সাহিত্যিকসহ আলবার্তো মোরাভিয়াকেও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু এসব হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতাকে ম্লান করেছে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বর্বর হত্যাকাণ্ড। একদিকে চলেছে গণহত্যা ও গণধর্ষণ, অন্যদিকে চলেছে তালিকাভুক্ত দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ও ১৪ ডিসেম্বর– এই দুটি দিবসই চিহ্নিত হয়ে আছে বুদ্ধিজীবী হত্যার কালো দিবস হিসেবে। আজ ২৫ মার্চের সেই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশেই আমার এই শ্রদ্ধা নিবেদন।

এই বুদ্ধিজীবীদের একমাত্র অপরাধ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সমর্থন। তাঁরা কোনো কোনো দেশের বুদ্ধিজীবীদের মতো অস্ত্র হাতে নেননি। তাঁদের হাতিয়ার ছিল শুধু কলম। তারপরও তাঁদের অনেককে গভীর রাতে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় তুলে নিয়ে নির্মম অত্যাচার দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। ঢাকার রায়েরবাজারের বধ্যভূমির দৃশ্য অনেককে ভিয়েতনামের মাইলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিহতদের কারও চোখ খুলে নেওয়া হয়েছে। কারও হাত, কারও

কিন্তু এসব হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতাকে ম্লান করেছে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বর্বর হত্যাকাণ্ড। একদিকে চলেছে গণহত্যা ও গণধর্ষণ, অন্যদিকে চলেছে তালিকাভুক্ত দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড

পা কাটা হয়েছে। এক নারী সাহিত্যিককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁরও উলঙ্গ এবং নির্মমভাবে নির্যাতিত দেহটি পাওয়া গিয়েছিল।

শহিদ মুনীর চৌধুরী একসময় একজন রাজনৈতিক অ্যাকটিভিস্ট ছিলেন। কিন্তু শহিদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. গোবিন্দ দেবসহ অনেকেই ছিলেন নিরীহ মননশীল পণ্ডিত। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তাঁরা। এই শহিদদের মধ্যে কেউ ছিলেন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ, চিকিৎসক, সাংবাদিক বা সংগীতজ্ঞ। ডা. ফজলে রাব্বি ছিলেন প্রগতিশীল মতামতের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। 'ললনা' পত্রিকার সম্পাদিকা এবং মেহেরুন্নেসা ছিলেন উদীয়মান কবি।

সবচেয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়, বাংলাদেশের এই বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকাটি তৈরি করে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর হাতে দিয়েছিল বাংলাদেশেরই একদল কুলাঙ্গার দেশদ্রোহী জামায়াতি নেতা ও কর্মী। এমনকি গভীর রাতে এই তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে হানাদারদের হাতে সমর্পণের কাজটি করেছে জামায়াত এবং তাদের সৃষ্ট রাজাকার, আল শামস ও আল বদরের দল। এরা শুধু দেশের সেরা মাথা ও মস্তিষ্ককে হত্যা করেনি, স্বজাতি ও স্বধর্মের মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়েছে। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নেতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর হাত রাঙা ছিল লাহোরে কাদিয়ানিবিরোধী দাঙ্গায় নিহত ৫০ হাজার মানুষের রক্তে। তার যোগ্য পূর্ব পাকিস্তানি শিষ্য গোলাম আযম আদালতের বিচারে দণ্ডিত হয়েছেন তিরিশ লাখ নর-নারী হত্যা এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার সহযোগী হিসেবে।

সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যেসব শহিদের নাম লেখা আছে তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমি ছিলাম ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন আমার শিক্ষক। সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন আমার সাংবাদিক শিক্ষক ও সহকর্মী। ডা. আলীম চৌধুরী ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডা. ফজলে রাব্বির রোগী ছিলাম তিন বছর। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন বড়ো ভাইয়ের মতো। তাঁর ছোটভাই সাহিত্যিক ও চিত্রপরিচালক জহির রায়হান ছিল আমার সহপাঠী। তাঁকে হত্যা করা হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। শহীদুল্লা কায়সারের খোঁজে মোহাম্মদপুরে গিয়ে সে আর ফিরে আসেনি।

পাকিস্তানি আমলের এই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের পর তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে বিএনপির শাসনামলে। এই হত্যাকাণ্ডগুলোর সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তারাও জামায়াত অথবা জামায়াতের উপদলগুলোর ঘাতক বলে অভিযোগ রয়েছে। আমাদের প্রধান কবি শামসুর রাহমানকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার চেষ্টা হয়। তিনি ভাগ্যের জোরে বেঁচে যান। খালেদা জিয়া তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এই হত্যা প্রচেষ্টার নিন্দা করা দূরের কথা, ঠাট্টার মুখে বলেছেন, 'শামসুর রাহমানকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে বলে একটা নাটক সাজানো হয়েছে।' বুদ্ধিজীবী হুমায়ুন আজাদকেও বাংলা একাডেমির কাছে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করা হয়। তিনিও মৃত্যু এড়াতে পারেননি।

শহিদ কিবরিয়াও শুধু একজন রাজনীতিক ছিলেন না। ছিলেন বুদ্ধিজীবীও। তাঁকে বোমা হামলায় হত্যা করা হয়। এ রকম হত্যাকাণ্ড আরও চলেছে। তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। শেখ হাসিনার ওপর যে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়েছিল তাতে তিনি আহত হয়েছেন, কপালগুণে বেঁচে গেছেন। এই প্রতিটি হত্যা প্রচেষ্টা ও হত্যাকাণ্ডে বিএনপি এবং জামায়াতের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এগুলো যে '৭১ এর গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যারই অনুসরণ ও ধারাবাহিকতা তাতে সন্দেহ পোষণের কোনো কারণ আছে কি? উদ্দেশ্যও একটাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিকেশ করে দেশটাকে মেধাশূন্য ও রাজনৈতিক নেতাশূন্য করা। তাহলে দেশটাকে আবার পাকিস্তানের ছায়ারাষ্ট্র, চাই কি পুরো তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করা সহজ হবে। দেশটিতে কোনো প্রতিরোধ থাকবে না। এই উদ্দেশ্যে '৭১ সালে বাংলাদেশকে বধ্যভূমিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছে পাকিস্তানি হানাদাররা। পরবর্তী সময় চেষ্টা করেছে তাদের দেশি দোসররা।

বাংলাদেশের মানুষ সাহসী এবং সচেতন, তাই '৭১ এর হানাদারদের যেমন তারা সশস্ত্র যুদ্ধে হারিয়েছে, তেমনি তাদের দোসরদের সন্ত্রাসকে পরাজিত করতে পেরেছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শহিদদের রক্তদান ব্যর্থ হয়নি।

সমকালের সৌজন্যে
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণহত্যা ১৯৭১: অন্য আলোয় দেখা

মুনতাসীর মামুন

প্রত্যেক গণহত্যার একটি রাজনীতি আছে। সে রাজনীতিকে রাজনীতি না বলে অপরাজনীতি বলা যায়, অজুহাত তৈরি করে গণহত্যার এবং গণহত্যা অস্বীকারের। জার্মানির হিটলার যে শুধু ইহুদিদের হত্যা করেছেন তা তো নয়। ইহুদিদের সঙ্গে প্রগতিশীল, উদার, কমিউনিস্টদেরও হত্যা করেছেন। এ কারণে আর্য শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্ব তৈরি করেছেন এবং ইহুদি হত্যার অজুহাত তৈরি করেছেন। এই ইহুদি হত্যা হলোকাস্ট নামে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

আর হিটলার এ অজুহাতে ইউরোপ জয় করতে চেয়েছেন। তবে হিটলারের প্রভুত্ব বিস্তারে এটিই একমাত্র কারণ ছিল না।

বাংলাদেশে গণহত্যারও একটি রাজনীতি ছিল। পাকিস্তানের রাজনীতি ও সুপার পাওয়ারদের ভৌগোলিক বা কৌশলগত স্বার্থ। পাকিস্তানের রাজনীতির বিষয়টি আমাদের জানা। কৌশলগতভাবে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য ছিল পাকিস্তানের মিত্র এবং মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বাংলাদেশে গণহত্যার সময় পাশ্চাত্য বা আমেরিকার জনমত ছিল গণহত্যার বিপক্ষে এবং তা এত জোরালো ছিল যে, তাদের সরকার কাঠামোয় পাশ্চাত্য বা পরে আমেরিকাকে নতিস্বীকার করতে হয়েছে।

এ গণহত্যা বিশ্বে উপেক্ষিত হলো এ কারণে যে, গণহত্যার বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হলে বিচারের বিষয়টি উঠে আসে, নৈতিকভাবে তা অস্বীকার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও এতে সাহায্য করেছে। ১৯৭৫ সালের পর সামরিক শাসিত সরকারগুলো মূলত পাকিস্তানের এজেন্ডা পালন করতে চেয়েছে। গণহত্যার চেয়ে বিজয়ের ওপর তারা জোর দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে জেনারেল জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়েছে জয়ের নায়ক হিসেবে। গণহত্যার বিষয়টি এলে জামায়াতে ইসলামী ও জঙ্গি মৌলবাদীদের প্রতিষ্ঠা করা যায় না, যারা তাদের মিত্র। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ

১৯৭৫ সালের পর সামরিক শাসিত সরকারগুলো মূলত পাকিস্তানের এজেন্ডা পালন করতে চেয়েছে। গণহত্যার চেয়ে বিজয়ের ... গণহত্যার বিষয়টি এলে জামায়াতে ইসলামী ও জঙ্গি মৌলবাদীদের প্রতিষ্ঠা করা যায় না, যারা তাদের মিত্র

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, গণহত্যাকারী হিসেবে জামায়াত ও তার সমর্থক বিএনপিকে দায়ী করেছে। ইতিহাসের এ দায় এড়ানো তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ছিল এ রাজনীতির কঠিন সিদ্ধান্ত, যেটি শেখ হাসিনা এককভাবে নিয়েছেন। গণহত্যার বিষয় উঠলেই প্রান্তিক মানুষরা রাজনীতিতে এসে যায়, ৩০ লাখ শহিদ ও পাঁচ লাখের ওপর নির্যাতিতার পরিজনের সমর্থন পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে। কারণ, নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থনকারীরা এতে এত সফল হয়েছে যে, অচিরেই বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াত ও জঙ্গি মৌলবাদীদের রাজনীতি লুপ্ত না হলেও বিপন্ন হয়ে ওঠবে।

গণহত্যার পটভূমি তখনই তৈরি হয়, যখন শাসক শাসন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করে এবং জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ তার সমর্থক হয়ে ওঠে। যখন তিনি কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠেন তখন তার মনে হয়, তিনি যা করছেন তা জাতি বা রাষ্ট্রের ভালোর জন্যই করছেন এবং দমন করাকে মনে করা হয় শক্তির প্রদর্শন, যা কর্তৃত্ব অটুট রাখবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য সে আশা ফলপ্রসূ হয় না। তবে কৌশলগত কারণে তা অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে গেলে তারা নিশ্চুপ থাকে। ইসরায়েলিরা যে গণহত্যা চালাচ্ছে আরবদের ওপর, তাতে পাশ্চাত্যের প্রায় সবাই এমনকি আমেরিকাও নিশ্চুপ। কারণ তা তাদের স্বার্থবিরোধী নয় এবং আরব রাষ্ট্রগুলো যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার, সেহেতু মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে সমঝোতা শুধু নয়, কূটনৈতিক সম্পর্কও তৈরি করেছে। আবার গণহত্যা শব্দটি যেহেতু সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত এবং ঐতিহ্যগতভাবে সবচেয়ে বড়ো অপরাধকে বোঝায়, সেজন্য নতুন কিছু সংজ্ঞা তৈরি করেছে পাশ্চাত্য, যেমন 'এথনিক ক্লিনজিং' 'ম্যাস মার্ডার' প্রভৃতি। মিয়ানমারে যখন রোহিঙ্গা গণহত্যা শুরু হয়, তখন তাকে প্রথমে 'এথনিক ক্লিনজিং' বলা হয়েছিল, যেন তাতে অপরাধ কমে। কিন্তু চীন ও ভারত যখন এই 'এথনিক ক্লিনজিং' সমর্থন শুরু করে, তখন যুক্তরাষ্ট্র একে গণহত্যা নামে অভিহিত করেছে এবং জাতিসংঘও তাই বলছে। চীন অবশ্য সবসময় নিজ স্বার্থে গণহত্যা সমর্থন করে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে যেহেতু বাংলাদেশ চীন বা ভারত- কারও বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না, সেহেতু রোহিঙ্গাদের দায় বাংলাদেশকেই বহন করতে হবে, যদি না দৈবশক্তি বাংলাদেশের প্রতি পক্ষপাত করে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যখন পাকিস্তান বাহিনী প্রবল গণহত্যা ও নির্যাতন চালায়, তখনও এমনটি ঘটেছিল। আজ প্রায় ৫০ বছর পার হয়ে গেছে। ভূরাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে এবং গণহত্যা-নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাজনীতি আবার আলোচনায় আসছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা যে গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছিল, বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। গণহত্যার মধ্যে অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষকে অকারণে হত্যা। জাতিগত বিদ্বেষ, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হত্যা। হানাদারদের কারণে মানুষকে বাস্তুত্যাগ করতে হয়েছে। আশ্রয়ের খোঁজে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পাওয়ার পরও মহামারী ও নানা কারণে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এসবই গণহত্যার মধ্যে অন্তর্গত।

বিভিন্ন উপায়ে সেসময় মানুষ হত্যা করা হয়েছে। কখনো কখনো নির্দিষ্ট একটি জায়গায় মানুষ এনে হত্যা করা হতো; যেমন, রায়েরবাজার বা মিরপুরের জলাভূমিতে। এসব জায়গা আমাদের কাছে পরিচিত বধ্যভূমি হিসেবে। অনেক সময় কিছু মানুষকে হত্যা করে একই সঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। এসব কবর আমাদের কাছে গণকবর হিসেবে পরিচিত।

নির্যাতনের পরিধি ব্যাপক। প্রতিদিন হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসররা বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করেছে। তাদের হত্যা করেছে। অল্পসংখ্যক মানুষ নির্যাতন কেন্দ্র থেকে ফিরে আসতে পেরেছেন। সব বয়সের নারীরা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন ক্যাম্পে আটকে রেখে নিয়ত ধর্ষণ করা হয়েছে। এ কারণেও মৃত্যু হয়েছে অনেকের। আমরা এসব মৃত্যুকেও গণহত্যার অন্তর্গত করব। মানুষ পালিয়ে গেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সহায়সম্পত্তি ফেলে। রাস্তাঘাটে মানুষকে হিন্দু না মুসলমান তা পরীক্ষা করা হয়েছে। সর্বত্র একটি আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়েছে। নির্যাতন করার জন্য শুধু ক্যাম্প নয়, আলাদা জায়গাও নির্দিষ্ট করা হতো। এসব কিছুই নির্যাতনের অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাঁচ লাখেরও বেশি নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সরকার তাদের সম্মান করে 'বীরাঙ্গনা' আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু পরে এই অভিধা সামাজিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কত মানুষ নির্যাতিত হয়েছে, তার হিসাব জানা যাবে না। তবে এক কোটি নারী-পুরুষ শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। শরণার্থী শিবিরে মানবেতর পর্যায়ে তাঁদের দিন কাটাতে হয়েছে। এটিও নির্যাতনের অন্তর্গত।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী। তারা বিভিন্ন কিলিং স্কোয়াড গড়ে তুলেছিল। যেমন আলবদর বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিল মতিউর রহমান নিজামী। তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘকে সম্পূর্ণভাবে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়। আলী আহসান মুজাহিদ ছিলেন এর উপনেতা। কামারুজ্জামান, কাদের মোল্লা প্রমুখ ছিলেন আলবদর বাহিনীর সংগঠক ও নেতা। ছাত্রসংঘের বাইরেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী ও অবাঙালিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল আরেকটি হত্যাকারী বাহিনী আল শামস।

মুসলিম লীগের খাজা খয়েরউদ্দিন, জামায়াতের গোলাম আযম, নেজামে ইসলামের ফরিদ আহমদ প্রমুখের উদ্যোগে বাংলাদেশজুড়ে সংগঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি। বলা হয়েছিল, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও বজায় রাখার জন্য এ কমিটি করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যন্ত এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। তবে এর মূল কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনের খোঁজখবর সেনাবাহিনী বা রাজাকারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, পরিত্যক্ত বাড়িঘর লুট করা, সম্পত্তি দখল করা প্রভৃতি। শান্তি কমিটির সদস্যরা এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণহত্যা ও প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতনের জন্য দায়ী।

স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, অবাঙালি, রাজনৈতিক কর্মী না হয়েও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল রাজাকার বাহিনী। প্রথমে জামায়াতের একেএম ইউসুফ খুলনায় রাজাকার বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে পাকিস্তান সরকারের অধীনে এই বাহিনী সংগঠিত করা হয়। এরাও হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

রাজনৈতিক দল হিসেবে গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী, নূরুল আমীনের নেতৃত্বে পিডিপি, ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম, ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান-এ-সবুর খান প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষভাবে গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনে প্রণোদনা জুগিয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সেটি নিয়ে ইদানীং আগ্রহ-বিতর্ক দু-ই দেখা দিয়েছে। বিষয়টি আমি একেবারে নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করিনি। কেননা এই বিতর্ক এবং তারপর আগ্রহ গণহত্যার বিষয়টিকে আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে। সম্প্রতি ইয়েমেন, সুদান প্রভৃতি দেশে বিশেষ করে মিয়ানমারের সামরিক সরকার ও অং সান সুচির সরকার যৌথ সম্মতিতে রাখাইন রাজ্যে যে গণহত্যা চালাচ্ছে তাতে এটিই প্রমাণিত যে, গণহত্যা বিষয় হিসেবে এখনও প্রাসঙ্গিক।

একটি গণহত্যায় কতজন নিহত হয়েছেন, তার নির্ভুল সঠিক হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। গণহত্যার তীব্রতা, স্থায়িত্ব, জনসংখ্যা সব মিলিয়ে গণহত্যায় নিহতদের আনুমানিক হিসাব করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ইউরোপজুড়ে নাৎসি, ফ্যাসিস্ট ও ফ্যালানজিস্টরা যে গণহত্যা চালায়, তার সময়সীমা ছিল চার বছরের ওপর। এলাকার ব্যাপকতা ছিল।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ খুবই ছোট, জনঘনত্ব খুব বেশি। সে কারণে এখানে গণহত্যায় একটি সুবিধা পায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা, রাজাকাররা। অর্থাৎ এখানে গণহত্যা ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে হয়নি। দ্রুত হয়েছে এবং জনঘনত্ব থাকায় বেশি মানুষ হত্যা সম্ভব হয়েছে। যেমন, চুকনগরে কয়েক ঘণ্টায় প্রায় ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের গণহত্যার বৈশিষ্ট্য হলো, এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ কোথাও আর হত্যা করা হয়নি।

কালের কণ্ঠের সৌজন্যে
লেখক: বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্যই ছিল

এ কে এম শাহনাওয়াজ

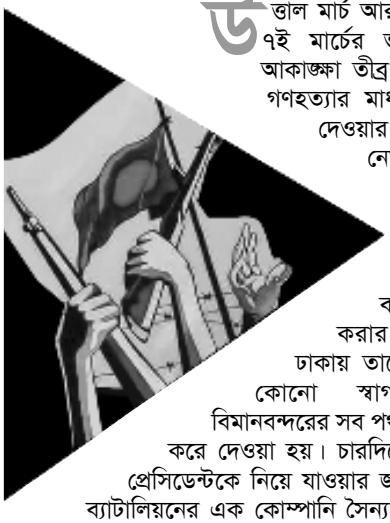

উত্তাল মার্চ আরও উত্তপ্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে বাঙালির। ওদিকে গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ছক কাটছে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা।

ষড়যন্ত্রের কৌশল হিসেবে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ঢাকায় আসেন। ঢাকায় তাকে বাঙালিদের পক্ষ থেকে কোনো স্বাগত জানানো হয়নি। বিমানবন্দরের সব পথ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। চারদিকে সৈন্যরা পাহারায় ছিল। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল ১৮ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানি সৈন্য। মেশিনগানে সজ্জিত ছিল গাড়ি।

ঢাকা সফর সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন- 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের অতিথি হিসেবে স্বাগত জানানো হবে।' ইয়াহিয়ার বিমান শ্রীলংকা ঘুরে ঢাকায় পৌঁছে বিকাল ৩টায়।

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি কতটা নাজুক ছিল তা পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিকের গ্রন্থে (উইটনেস টু সারেন্ডার) জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'আমি অনেক প্রেসিডেন্ট আর দেশের প্রধানদের আগমন দেখেছি; কিন্তু ১৫ মার্চ ঢাকায় যে পরিবেশের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এসে অবতরণ করলেন, তা আমি কখনই ভুলব না। বিমানবন্দরে প্রবেশের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

টার্মিনাল ভবনের ছাদের ওপর স্টিলের হেলমেট পরা প্রহরীদের দাঁড় করানো হয়। বিমানবন্দর ভবনের প্রতিটি সদস্যকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। পিচঢালা পথে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা পিএএফ গেটে সেনাবাহিনীর ভারি অস্ত্রে সজ্জিত একটা দলকে বসানো হয়।

পদাতিক সৈন্যের (১৮ পাঞ্জাব) ট্রাকভর্তি একটি কোম্পানি (প্রায় ১০০ জনের) ফটকের বাইরে মেশিনগান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সতর্কতার সঙ্গে

6

১৯ মার্চ বেলা ১১টায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে বৈঠকের ফল জানার জন্য। ... কিছুর আশা করছি এবং সবচেয়ে খারাপের জন্যও প্রস্তুত রয়েছি।' এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনার অচলাবস্থার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়

9

বাছাই করা অল্প কয়েকজন কর্মকর্তাকে বিমানবন্দরের ভেতরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের বিশেষ নিরাপত্তা পাস দেওয়া হয়।

কোনো ফুলের তোড়া ছিল না, ছিল না কোনো বেসামরিক কর্মকর্তা, শহরের অভিজাতদের কেউ নেই, নেই সাংবাদিকদের ধাক্কাধাক্কি বা ক্যামেরার ক্লিক। এমনকি সরকারি ফটোগ্রাফারকেও অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ ছিল এক অদ্ভুত ভীতিকর পরিবেশ, যেখানে জড়িয়ে ছিল মৃত্যুর স্তব্ধতা।' ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন। এ বৈঠক প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলে।

ঢাকার প্রেসিডেন্ট হাউসে ইয়াহিয়ার তখন কার্যত বন্দিদশা। বিরাট সশস্ত্র রক্ষীদল ছাড়া তিনি চলাফেরা করতে পারেন না। পূর্ব পাকিস্তানে তখন শেখ মুজিবের কিংবা তার দলের নির্দেশ ছাড়া কিছুই চলছিল না, কোনো কাজই হচ্ছিল না। আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলিই ছিল তখন দেশের সর্বোচ্চ আইন। ইয়াহিয়া কর্তৃত্ব প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া খানের প্রতি মানুষের তেমন একটা আস্থা ছিল না।

ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল এ বৈঠক ছিল ভুট্টো-ইয়াহিয়ার একটি সাজানো নাটক। সময়ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু নয়। একদিকে ঢাকায় ইয়াহিয়া খান আলোচনার মাধ্যমে অগ্রগতি ঘটাতে চাইছেন, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো দম্ভোক্তি করছেন যে তাকে ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তা প্রতিহত করবেন।

এদিনই ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেন। মূল অপারেশনাল পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের জন্য ১৮ মার্চ সকালে জিওসির কার্যালয়ে মেজর জেনারেল খাদিম রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি বৈঠকে বসেন। এ সময় সম্ভবত গণহত্যার পরিকল্পনা পাকা করা হয়।

১৯ মার্চ বেলা ১১টায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে বৈঠকের ফল জানার জন্য। বৈঠক শেষ হলে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেন বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সবচেয়ে ভালো কিছুর আশা করছি এবং সবচেয়ে খারাপের জন্যও প্রস্তুত রয়েছি।' এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনার অচলাবস্থার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একই দিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টা হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ড. কামাল হোসেনের মধ্যে দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চলে। ঠিক একই সময়ে, ১৯ মার্চ ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রারম্ভিক বিস্ফোরণ ঘটল বলা যেতে পারে। বিক্ষুব্ধ জনতা পাক সৈন্যদের পথে দৃঢ় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করে।

এ ঘটনায় দু'জন নিহত ও পাঁচজন আহত হয় বলে সরকার স্বীকার করে। বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী এখানে সেদিন আনুমানিক ১৫০ জন নিহত হয় বলে জানা যায়। একই দিনে পাক বাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু একটি বিবৃতি প্রদান করে বলেন, 'যারা মনে করেন, তাদের বন্দুকের বুলেট দিয়ে জনগণের সংগ্রাম বন্ধ করতে সক্ষম হবেন তারা আহাম্মকের স্বর্গে আছেন।'

ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠকে ইয়াহিয়া মুজিবের কাছে 'জয় বাংলা' কথাটির অর্থ জানতে চান। মুজিব সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, 'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়েও তিনি কালেমা পাঠের সঙ্গে 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করবেন।'

এইদিন রাতে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছুসংখ্যক সৈন্য টাঙ্গাইল থেকে জয়দেবপুরে আসছিল। পথে বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের থামিয়ে কয়েকজন সৈন্যকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে চারটি রাইফেল ও কয়েকটি স্টেনগান ছিনিয়ে নেয়।

২০ মার্চ একদিকে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলছিল, অন্যদিকে লে. জেনারেল আবদুল হামিদ ও লে. জেনারেল টিক্কা খান গণহত্যার নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের সময় আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করার একটি পরিকল্পনা ছিল। ইয়াহিয়া খান আপাতত এ পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেন।

এদিন কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য ঢাকায় এলেন। ভুট্টোও ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণের জবাবে জানালেন, তিনি প্রেসিডেন্টের জবাবে সন্তুষ্ট এবং শিগগিরই ঢাকা আসছেন। এ 'সন্তুষ্ট' বলতে তিনি কি বোঝালেন তা প্রকাশ করলেন না। এদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ ঢাকায় এসে বিভিন্ন সেনানিবাস পরিদর্শন শুরু করলেন।

২৩ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক স্থগিত থাকে। এদিন ছিল পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক দিবস। দিবসের স্বাভাবিক অনুষ্ঠানগুলো বাতিল করা হলো। ইয়াহিয়া খান এমন ভান করলেন যেন তিনি একটি মীমাংসার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ব্যস্ত আছেন। এ দিবসে একটি দুঃসাহসিক কাজ করে ছাত্র-জনতা। তারা পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেয়।

পাশাপাশি স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে, জয় বাংলা বাহিনীর চারটি প্লাটুন মার্চপাস্ট করে বাংলাদেশের পতাকাকে অভিবাদন জানান। এই জয় বাংলা বাহিনী বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। ২৩ মার্চকে আওয়ামী লীগ 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। তারা পাকিস্তানের পতাকা পোড়ায়, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

একই সঙ্গে খুব ঘটা করে টানানো হয় বঙ্গবন্ধুর ছবি। রেডিও এবং টেলিভিশনে নতুন জাতীয় সংগীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাজানো হয়। সারা শহরে এ পতাকা উড়তে থাকে।

এদিন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। করাচি থেকে এমভি সোয়াত নামে একটি জাহাজ এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। বন্দরের শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অস্ত্র খালাস না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের বিশ্বাস এসব অস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করা হবে। শ্রমিকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শেষে সিদ্ধান্ত হয় এ অস্ত্র খালাস করা হবে; কিন্তু তা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এগুলো রাখা হবে বন্দরের ট্রানজিট ক্যাম্পে।

২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসে। আগের শাসনতান্ত্রিক কমিটির প্রস্তাব বাদ দিয়ে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের প্রস্তাব দেওয়া হবে। ইসলামাবাদ এবং ঢাকা থেকে দুটো কমিটি আলাদা করে রিপোর্ট জমা দেবে। এ দুই রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় পরিষদে বৈঠক বসবে এবং এর ভেতর থেকে একটি সমাধান বের করার চেষ্টা নেওয়া হবে।

২৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চে গণহত্যা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ড. কামাল হোসেনের গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, '২৪ মার্চ সন্ধ্যার বৈঠকের জন্য যখন আওয়ামী লীগের আলোচক দল রওয়ানা হতে যাচ্ছে, তখন শেখ মুজিব বলে দিলেন, রাষ্ট্রের নামের জন্য আমরা যেন 'পাকিস্তান কনফেডারেশন' (Confederation of Pakistan) নামটি প্রস্তাব করি।

তিনি ইঙ্গিত দিলেন আমরা যেন ব্যাখ্যা করি যে, জনগণের অনুভূতির স্বার্থে এর প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রস্তাব স্বাধীনতার জন্য জনগণের অনুভূতির তীব্রতা আংশিকভাবে হলেও প্রতিফলিত হয়, কারণ উত্তালভাবে এগিয়ে চলা গণ-আন্দোলনের অগ্রবাহিনীর তরুণ জঙ্গি নেতাদের দ্বারাই তা উদ্ভাবিত ও উচ্চারিত (articulated) হয়েছিল।

...২৫ মার্চের ভয়াবহ রাতের আগে সারাক্ষণ আমি একটি টেলিফোন পাওয়ার অপেক্ষা করলাম। ওই টেলিফোন কখনোই আসেনি। এমনকি ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আমি যখন শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন শেখ মুজিব জানতে চাইলেন, আমি ওই টেলিফোন পেয়েছি কি না। আমি তাকে জানালাম, আমি তা পাইনি।

ওই রাতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি জনগণের ওপর আক্রমণ চালালো এবং গণহত্যা ও রক্তস্নান শুরু হলো, যা এড়ানোই ছিল আলাপ-আলোচনা চালানো ও দরকষাকষির মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানোর প্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য।' (ড. কামাল হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬, পৃ. ৯৩-৯৫)।

বঙ্গবন্ধুর কাছেও স্পষ্ট ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য মুক্তির লড়াই এখন অনিবার্য। তবুও তিনি সতর্ক ছিলেন বাঙালিকে যেন পাকিস্তান ভাঙার অভিযোগে অভিযুক্ত করা না হয়। সেই অর্থে বলা যায়, ২৬ মার্চের নতুন সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল বিচক্ষণতার আর কৌশলের। অন্যদিকে পাকিস্তানি জান্তার চিন্তা ছিল অমানবিক ও আসুরিক। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মধ্যরাতের গণহত্যার মধ্য দিয়ে।

যুগান্তরের সৌজন্যে
লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জননী রমা চৌধুরী

বিনয় দত্ত

১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর বিদুগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবেই কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ রমা চৌধুরীর ... এ সময় তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে দেশান্তরি হয়ে যান

১.

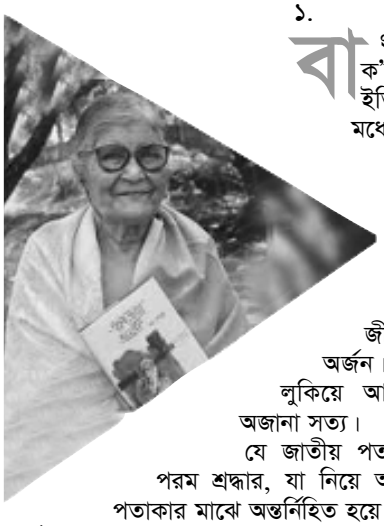

বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে যে ক'জন বীরাঙ্গনার সম্ভ্রমহানির ইতিহাস জড়িয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম তিনি। তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে বাংলাদেশটা আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই দেশের জন্য তিনি তাঁর সম্ভ্রম উৎসর্গ করেছেন, উৎসর্গ করেছেন জীবনের অনেক খ্যাতিময় অর্জন। তাঁর ত্যাগের পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক অজানা গল্প, অজানা সত্য।

যে জাতীয় পতাকা আজ আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার, যা নিয়ে আমাদের গর্ব, সেই জাতীয় পতাকার মাঝে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে তাঁর গল্প। ১০:৬ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার গাঢ় সবুজ এবং মাঝখানে লাল বৃত্তের জাতীয় পতাকার মধ্যে লুকিয়ে রমা চৌধুরী, তারামন বিবি, জয়ন্তী বালা দেবী, আছিয়া বেগমসহ অসংখ্য বীরাঙ্গনার গল্প, যাঁরা নিজেদের সবচেয়ে পবিত্র সম্পদটুকু দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। বলছিলাম রমা চৌধুরীর কথা, যিনি নিজেই একজন আদর্শ ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে স্বীয় আমাদের কাছে। '... স্বপ্ন দেখব বলে/ আমি দুচোখ মেলেছি/ .... তাই স্বপ্ন দেখব বলে আমি দুচোখ মেলেছি'।

ভারতীয় বাঙালি সংগীতশিল্পী ও গীতিকার মৌসুমী ভৌমিকের মতো রমা চৌধুরীও জীবন সায়াহ্নে বলেছিলেন, 'আমি বাঁচতে চাই।' নতুন করে স্বপ্ন দেখার প্রয়াস নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। শেষ বয়সে এসে তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপসহ নানা জটিল রোগ। এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের বেডে তিনি স্বপ্ন দেখতেন নতুন করে বাঁচার। আরও কিছু বলার, দেশকে নতুন করে কিছু দেওয়ার, দেশের জন্য নতুন উদ্দীপনায় কিছু করার, সারা দেশে তাঁর প্রিয় অনাথাশ্রমের শাখা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। '.... তোমার আমার ক্লান্ত দেহ,/ শব্দে কথায় ভারাক্রান্ত।/ কত রকম কথা বলা/ বলতে বলতে চলতে চলতে/ পৌঁছে গেছি এ কোন প্রান্ত।'

মৌসুমী ভৌমিকের গানের মতো রমা চৌধুরীও ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী। বয়স এবং অসুস্থতা দৃশ্যত রমা চৌধুরীকে ক্লান্ত করলেও মনের শক্তিতে তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী তখন পর্যন্ত। যে বীভৎসতা, যে দুর্বিপাক, যে পীড়ন-নির্যাতন, কথার তির্যক আঘাত, অপমান, গ্লানি তিনি দেখেছেন, সহ্য করেছেন তার তুলনায় তাঁর শারীরিক অসুস্থতা কিছুই নয়। তিনি অসম্ভব তেজস্বী একজন নারী, যার ছায়াতলে যুগের পর যুগ রইলেও তিনি ছায়া সরাবেন না, বরং পরম মমতায় কোলে তুলে নেবেন।

২.

১৯৪১ সালের ১৪ অক্টোবর চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে রমা চৌধুরীর জন্ম। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা রোহিনী চৌধুরীকে হারান। রোহিনী বাবুকে হারিয়ে পরিবারের সচ্ছল অবস্থার করুণ পরিস্থিতি তৈরি হলেও রমা চৌধুরীর মা মোতিময়ী চৌধুরী থেমে থাকার মানুষ নন। মোতিময়ী চৌধুরী শত বাধা পেরিয়ে তাঁকে পড়াশোনার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে যান। মায়ের অনুপ্রেরণায় ১৯৫২ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে বোয়ালখালীর মুক্তকেশী গার্লস হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৫৬ সালে কানুনগোপাড়া কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। সেই সময় মেয়েদের এইচএসসি পড়া মানে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া। অল্প পড়াশোনার পর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিত। শুধু মায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন।

মায়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ষাটের দশকে তখন নারীদের উচ্চশিক্ষা এত সহজ ছিল না। সেই সময় রমা চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের তিনিই প্রথম নারী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। তাই তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'সুযোগ পেলে আবার ভর্তি হতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে মাস্টার্স করতে চাই ইংরেজিতে।'

তাঁর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে সলীল চৌধুরীর মতো বলতে হয়, '... দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে/ বন্যার মতো বেরিয়ে/ যুগ সঞ্চিত সুপ্তি দিয়েছে সাড়া/ হিমগিরি শুনল কি সূর্যের ইশারা/ যাত্রা শুরু উচ্ছল চলে দুর্বার বেগে তটিনী,/ উত্তাল তালে উদ্দাম নাচে মুক্ত স্রোত নটিনী ....'।

রমা চৌধুরীর জন্ম অন্য সাধারণ নারীদের মতো হতে পারত, স্বামী সংসার, সন্তানসন্ততি নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে দিন পার করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা পারেননি। মাত্র ২০ বছর বয়সে কক্সবাজার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ এক যুগের ওপরে তিনি বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তিনি বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হন। এরই মধ্যে আসে উনিশ শ একাত্তর, স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর বিদুগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবেই কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ রমা চৌধুরীর সামনে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে দেশান্তরি হয়ে যান। সাগর আর টগর দুই সন্তানকে নিয়ে রমা চৌধুরী পৈতৃক ভিটা পোপাদিয়ায় বসবাস শুরু করেন।

১৯৭১ সালের ১৩ মে সকালবেলা, পোপাদিয়ায় স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা রমা চৌধুরীর বাড়িতে আক্রমণ চালায়। সেদিন পাকিস্তানি এক সৈনিক তাঁর সম্ভ্রম কেড়ে নেয়। তাঁর ওপর চালায় শারীরিক নির্যাতন। এই ক্ষত তিনি কখনোই ভুলতে পারেননি।

ওই বিভীষিকার বর্ণনা রয়েছে তাঁর 'একাত্তরের জননী' বইয়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'যখন আমাকে নির্যাতন করতে উদ্যত হলো পাক সেনা, তখন জানালার পাশে দাঁড়ানো আমার মা ও দুই ছেলে বারবার আকুতি করছিলেন। ছিল আমার পোষা বিড়াল কনুও। তখন আমি মাকে আমার সন্তানদের নিয়ে সরে যেতে বলেছিলাম।'

সম্ভ্রম হারানোর পর রমা চৌধুরী পাকিস্তানি দোসরদের হাত থেকে পালিয়ে পুকুরে নেমে আত্মরক্ষা করেছিলেন। হানাদাররা তাঁকে না পেয়ে গানপাউডার দিয়ে ঘরবাড়িসহ যাবতীয় সহায়-সম্পদ সবকিছুই পুড়িয়ে দেয়। এ সময় এলাকাবাসী কেউ কেউ তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজের আত্মীয়রাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। রমা চৌধুরী তাঁর 'একাত্তরের জননী' বইয়ে লিখেছেন, '... আমার আপন মেজো কাকা সেদিন এমন সব বিশ্রী কথা বলেছিলেন, লজ্জায় কানে আঙুল দিতে বাধ্য হই। আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না, দোকানে গিয়ে কিছু খাবারও সংগ্রহ করতে পারলাম না মা ও ছেলেদের মুখে দেবার জন্য।'

ঘরবাড়ি সহায়-সম্বলহীন বাকি আটটি মাস তিনি দুই ছেলে সাগর, টগর আর বৃদ্ধ মাকে নিয়ে জলে-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে দিন পার করেছেন। পোড়া ভিটায় কোনোরকমভাবে পলিথিন আর খড়কুটো মাথায় আর গায়ে দিয়ে রাত কাটিয়েছেন। এভাবে বহু কষ্টে যুদ্ধের দিনগুলো পার করেন। 'তবু কিছুই যায় না বলা/ শব্দ খেলায় কেবল ফাঁকি/ কথার পিঠে কথা সাজাই/ আমরা এখন একলা থাকি .../ আমরা এখন একলা থাকি।'

রমা চৌধুরীর জীবনটা যেন গানের প্রতিটি লাইনের মতো। কতটা আত্মপ্রত্যয়ী হলে তিনি নিজের দুঃসহ দিনের কথা, নিজের কষ্টের কথা, নিজের সম্ভ্রম হারানোর কথা নিজেই লিখে যান বইয়ে। সেই সময়ের আত্মীয়, পরিজন, সমাজ, ধর্ম, সংস্কার সবকিছুরই শেষ মার্জিন তিনি দেখেছিলেন। তাই তিনি নিজেই নিজের পথ বেছে নিয়েছেন।

৩.

মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ে তাঁর ছেলে সাগর ছিল সাড়ে পাঁচ বছরের। দুরন্ত সাগর মিছিলের পেছনে পেছনে 'জয় বাংলা, জয় বাংলা' বলে ছুটে বেড়াত। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে একসময় সাগর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর মারা যায়। সাগরের মৃত্যুর ১ মাস ২৮ দিনের মাথায় ৩ বছরের টগরও মারা যায়। ছেলেদের হিন্দু সংস্কারে না পুড়িয়ে তিনি মাটিচাপা দেন। দুই সন্তানের দেহ মাটিতে আছে বলে রমা চৌধুরী জুতা পরা বন্ধ করে দেন।

ছেলেদের মৃত্যুর স্মৃতি কখনোই তিনি ভুলতে পারেননি। খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় তাঁর পায়ে ঘা হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনদের জোরাজুরিতে তিনি অনিয়মিতভাবে তখন জুতা পরা শুরু করেন। 'হয়ত তুমি পাশেই আছো/ তবু তোমায় ছুঁতে কি পাই/ তোমার বুকে ব্যথা ছিল/ কেমন করে কথা দিয়ে/ সেই ব্যথাতে আঙুল বুলাই'।

পরপর দুটি সন্তান হারিয়ে রমা চৌধুরী পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। সন্তান হারানোর কষ্ট যে কতটা কঠিন, তা একমাত্র মা-ই জানেন। সেই কঠিন সময়ও তিনি পার করেছেন। প্রিয় সন্তানদের শোক তাকে ভয়ানক কাতর করে তোলে। সেই কাতরতায় তিনি দীর্ঘ সময় পার করেছেন।

প্রথম সংসারের পরিসমাপ্তি ঘটলে রমা চৌধুরী দ্বিতীয়বার সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখেন। দ্বিতীয়বার সংসার বাঁধতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন। দ্বিতীয় সংসারের ছেলে টুনু ১৯৯৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর বোয়ালখালীর কানুনগোপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। টুনুর মৃত্যুর পর রমা চৌধুরী একেবারেই জুতা পরা ছেড়ে দেন।

মৌসুমী ভৌমিকের গানের মতো রমা চৌধুরীও নিজের কথাগুলোকে লিখে গেলেন। 'আমার কিছু কথা ছিলো/ ... বুঝতে হলে কথার মানে,/ চেনা পথের বাহিরে চল।'

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তিনি লেখালেখিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, 'আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমি লেখ্যবৃত্তি গ্রহণ করেই জীবিকা নির্বাহ করব। অনেকটা সে কথাকে বাস্তবায়ন করার জন্যই লিখছি। আর এ ছাড়া এই অবস্থায় আমার অন্য কিছু করারও সুযোগ নেই। বাঁচতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমি কারো গলগ্রহ হতে কখনো পছন্দ করতাম না, এখনো করি না।'

প্রথমে তিনি একটি পাক্ষিক পত্রিকায় লিখতেন। সম্মানির বিনিময়ে তাঁকে পত্রিকার ৫০টি কপি দেওয়া হতো। সেই পত্রিকা বিক্রি করেই চলত তাঁর জীবন-জীবিকা। পরে তিনি নিজেই নিজের লেখা বই প্রকাশ করে বই ফেরি করতে শুরু করেন। তাঁর সব বইয়ের প্রকাশক আলাউদ্দিন খোকন ছায়াসঙ্গী হিসেবে সবসময়ই তাঁর পাশে থেকেছেন।

প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা– সবমিলিয়ে তিনি নিজের ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্য', 'নজরুল প্রতিভার সন্ধানে', 'স্বর্গে আমি যাব না', 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে জীবনদর্শন', 'শহীদের জিজ্ঞাসা', 'নীল বেদনার খাম', 'সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', 'ভাববৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে/ সবাই করে ভয়/ তবে পরান খুলে/ ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা/ একলা বলো রে।'

কবিগুরুর এই কথাটি রমা চৌধুরী পদে পদে অনুসরণ করেছেন। তিনি নিজেই নিজের বই ফেরি করে বিক্রি করেছেন। নিজের লেখা বইগুলো তিনি

সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ থেকে প্রতি মাসে তাঁর হাজারবিশেক টাকা আয় হতো। এ দিয়েই তিনি থাকা-খাওয়ার সংস্থান করেছেন।

৪.

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চেরাগী পাহাড়েই লুসাই ভবনের অবস্থান। সেই ভবনের ৪০৮ নম্বর কক্ষটিতে থাকতেন রমা চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে থাকত চারটি বিড়াল। আর তাঁর ছায়াসঙ্গী আলাউদ্দিন খোকন। এই কক্ষ থেকেই তিনি প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে নামতেন। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি একই সঙ্গে পরিচালনা করেছেন 'দীপংকর স্মৃতি অনাথালয়' নামের একটি অনাথ আশ্রম। প্রচণ্ড কষ্টের জীবন কাটলেও তাঁর দুচোখে স্বপ্ন ছিল সুখ-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।

দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে অনাথ আশ্রম খুলতে চেয়েছিলেন। সব ধর্মের অনাথরা সেই আশ্রমে থাকবে। মনুষ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। তিনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন প্রতিনিয়ত।

তাঁর দৃপ্ত ছুটে চলা দেখে সবারই মনোবল বহুগুণ বেড়ে যেত। এই মনোবল নতুন দিনের, নতুন স্বপ্নের, নতুন সত্যের। কবির মতো বলতে হয়– 'একদিন সূর্যের ভোর/ একদিন স্বপ্নের ভোর/ একদিন সত্যের ভোর/ আসবেই ...'।

২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহে রমা চৌধুরী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেখা করেননি, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে রমা চৌধুরী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। খালি পায়ে তার সঙ্গে সাক্ষাতে নিজের কষ্টের কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সহযোগিতা করতে চাইলে রমা চৌধুরী বিনয়ের সঙ্গে তা ফিরিয়ে দেন। বরং উলটো তাকে উপহার দিয়ে এসেছিলেন নিজের লেখা 'একাত্তরের জননী' গ্রন্থটি।

সবকিছু হারিয়ে একরকম নিঃস্ব হয়েছেন তিনি। জীবনের দীর্ঘ সময় পার করে ফেলেছেন। এখন এই আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে তিনি কিই বা করবেন। তাই কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেননি। নিজের সন্তানরা শহিদের মর্যাদা পায়নি, কিন্তু তাঁর কাছে ওরা শহিদ। এ কথাটি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

একাত্তর রমা চৌধুরীকে দিয়েছে পোড়া ভিটে, কাঁধের ঝোলা, ছেলের শোক আর খালি পা। এ নিয়েই ছিল রমা চৌধুরীর দিনযাপন। ১৯৯৫ সালের মার্চে একবার মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে রমা চৌধুরী আক্রান্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেড় মাস আলাউদ্দিন তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেছেন। এই অসুস্থতায় তাঁর ডান পাশ অবশ হয়ে পড়েছিল, একটি চোখও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ ভয়ানক সময়ে আলাউদ্দিন যেন দেবতারূপে রমা চৌধুরীকে একা টেনে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

আলাউদ্দিনের শুশ্রূষায় তিনি আবার চলার শক্তিও ফিরে পান। শুরু হয় আবারও তাঁর পথচলা। কাঁধে ঝোলা, কানে হিয়ারিং এইড লাগানো রমা চৌধুরী হেঁটে যাচ্ছেন চট্টগ্রামের ফুটপাত ধরে। এ দৃশ্য সবার পরিচিত। বয়সের কারণে তাঁর সুস্থতা টিকে উঠতে পারেনি। সলীল চৌধুরীর মতো বলতে হয়– 'ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রী/ এখানে থেমোনা/ এ বালুচরে আশার তরণী তোমার/ যেন বেঁধো না'।

রমা চৌধুরী যেন আলোর পথযাত্রী হয়ে ছুটে বেড়াতেন। বছরখানেক অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। সেই সময় চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন আলাউদ্দিন। কোথাও সহযোগিতা পেয়েছেন, কোথাও পাননি। অবশেষে সরকারি নির্দেশে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর জন্য কেবিনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সময়ও সার্বক্ষণিক জেগে ছিলেন সেই আলাউদ্দিন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শত বছর বেঁচে থাকার। কিন্তু শত বছর আর ছোঁয়া হয়নি এ যোদ্ধার। ২০১৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ভোরে ৭৭ বছর বয়সে রমা চৌধুরী নিজের জীবনের অধ্যায় সমাপ্ত করে দেন।

৫.

জীবনের অনেক বড়ো সময় তিনি একাই যুদ্ধ করে এগিয়েছেন। কখনো ভালোবাসা পেয়েছেন, কখনো তির্যক বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েছেন, কখনো তাঁকে কেউ আগলে রেখেছেন, কখনো তিনি কাউকে আগলে রেখেছেন, কখনো স্মৃতি তাঁকে ক্রন্দনে ভাসিয়েছে। এখন রমা চৌধুরী নিজেই স্মৃতি হয়ে ফিরছেন আমাদের কাছে।

মৌসুমী ভৌমিকের গানের মতো বলতে হয়– 'এক একটা রাত বড় একা লাগে॥/ পাশ ফিরে শুলে খাট কঁকিয়ে উঠে/ কান পেতে থাকি হাওয়া জেগে উঠে না/ কান পেতে থাকি কেউ জেগে উঠে না'।

একজন হার না-মানা নারীর নাম রমা চৌধুরী। একজন দৃপ্ত সৈনিকের নাম রমা চৌধুরী। রমা চৌধুরী এই সময়ে মরতে চাননি। অনেক কিছুই তাঁর লেখার বাকি ছিল। দেশকে অনেক কিছুই দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। গোটা জীবন স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী আর আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন রমা চৌধুরী। দেশব্যাপী অনাথ আশ্রম গড়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে এখন বহু দূরে। হয়তো তিনি দেখছেন, আমরা তাঁকে নিয়ে লিখছি। মৌসুমী ভৌমিকের গানের মতো বলতে হয়– 'এখনো গল্প লেখো,/ গান গাও প্রাণ ভরে,/ ... তোমাদের ভালোবাসা/ এখনো গোলাপে ফোটে'।

তিনি এতটাই তেজস্বী যে, কারও দান-দক্ষিণা গ্রহণ করতেন না, নিজের কষ্টের কথা কাউকে মুখ ফুটেও বলতেন না। জীবনের সর্বস্ব হারিয়েও একা দীপ্তিময় ভূমিকায় হেঁটে গিয়েছেন গোটা জীবন। যুদ্ধদিনের বিভিন্ন ঘটনাসহ অসংখ্য ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন তিনি। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, দেখিয়েছেন। তিনি আমাদের সবার প্রিয়, জননী রমা চৌধুরী। কবির ভাষায় বলতে হয়– 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান/ তোমার মৃত্যুর মাঝে তুমিই মহান॥'।

লেখক: সাংবাদিক, যমুনা টেলিভিশন

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

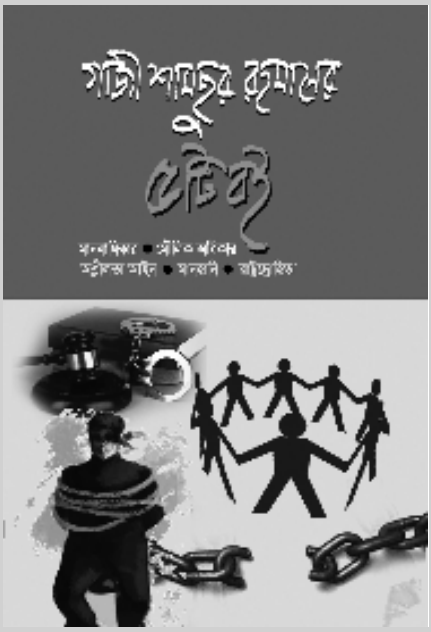

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যম সংবাদ

রাজধানীর একটি হোটেলে দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেনের হাতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ *পিআইডি*

প্রেস কাউন্সিল পদক পেল ইত্তেফাক

গণমাধ্যম যেন মালিকের স্বার্থে ব্যবহার না হয় : রাষ্ট্রপতি

মর্যাদাপূর্ণ প্রেস কাউন্সিল পদক পেয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৮ ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা ক্যাটাগরিতে ইত্তেফাককে এ পদক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেনের হাতে এ পদক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক গোলাম সারওয়ারকে আজীবন সম্মাননা (মরণোত্তর) দেওয়া হয়। আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী, গ্রামীণ সাংবাদিকতা ক্যাটাগরিতে বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুক্তবার্তার সহকারী সম্পাদক মো. মুরশিদ আলম, উন্নয়ন সাংবাদিকতা ক্যাটাগরিতে ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি মো. জসীম উদ্দিন, নারী সাংবাদিকতা ক্যাটাগরিতে মাদারীপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুবর্ণগ্রাম পত্রিকার বার্তা সম্পাদক আয়শা সিদ্দিকা (আকাশী), আলোকচিত্র সাংবাদিকতা ক্যাটাগরিতে নিউ এইজের ফটোসাংবাদিক সনি রামানীকে প্রেস কাউন্সিল পদক দেওয়া হয়।

রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কাউন্সিল দিবস ও প্রেস কাউন্সিল সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেন, দেশের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী গ্রুপ এখন অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক। এটা নিঃসন্দেহে গণমাধ্যমের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, এসব গণমাধ্যম যাতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়। তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে যাতে এসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিলকে 'ওয়াচডগ'-এর ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, প্রেস কাউন্সিলের সদস্য বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল প্রমুখ।

সূত্র: ১৯ মে ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ইত্তেফাক

গত ১০ বছরে দেশে গণমাধ্যম ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে

সংসদে প্রশ্নোত্তরে তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সংসদকে জানিয়েছেন, সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের অধিকার সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতোমধ্যে সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের চেতনায় দেশে গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১০ বছরে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের সব শাখা ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে অনেক সাংবাদিককে আর্থিক ও চিকিৎসা সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। এ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তরে সরকারি দলের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুলের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান।

তথ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং সব সংবাদপত্রের গণমাধ্যমকর্মীর শতকরা ৪৫ ভাগ মহার্ঘ ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নবম ওয়েজ বোর্ড ইতোমধ্যে রিপোর্ট প্রদান করেছে। অচিরেই নবম ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সারা দেশের সাংবাদিকদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিরোধী দল জাতীয় পার্টির (জাপা) এমপি ডা. রুস্তম আলী ফরাজীর প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহমুদ জানান, বর্তমানে সারা দেশে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ২ হাজার ৬৫৪টি। এর মধ্যে দৈনিক ১ হাজার ২৪৮, সাপ্তাহিক ১ হাজার ১৯২ এবং পাক্ষিক পত্রিকার সংখ্যা ২১৪টি। তথ্যমন্ত্রী জানান, সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গণমাধ্যমকর্মীদের চাকরি সুরক্ষার জন্য 'গণমাধ্যমকর্মী (চাকরি ও শর্তাবলি) আইন' প্রণয়ন করা হচ্ছে।

সূত্র: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ইত্তেফাক

জন্মদিনে সবার ভালোবাসায় সিক্ত কালের কণ্ঠ

'আংশিক নয়, পুরো সত্য'– এই ব্রত ও বিশ্বাসে তুমুল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ১০ জানুয়ারি উদযাপিত হলো দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র 'কালের কণ্ঠ'র দশম জন্মদিন। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে আবারও নতুন করে উচ্চারিত হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশকে এগিয়ে নেওয়া ও গণতান্ত্রিক চেতনায় মানবকল্যাণে

আগের মতোই এগিয়ে চলার দৃঢ়প্রত্যয়। প্রতিষ্ঠার ৯ বছর পেরিয়ে নতুন বছরে নতুন আবহে রাষ্ট্রীয়-সরকারি, বেসরকারি, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, আর্থ-বাণিজ্যিক অঙ্গনের নানা পর্যায়ের অতিথি, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রাণজাগানিয়া অংশগ্রহণ আর দিনভর ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয় কালের কণ্ঠ পরিবার।

সকাল থেকেই শুভেচ্ছা জানাতে ফুল নিয়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া লিমিটেড কমপ্লেক্সের কালের কণ্ঠ কার্যালয় প্রাঙ্গণে আসতে থাকেন তাঁরা।

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী কালের কণ্ঠ'র সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন ও নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামালসহ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটেন। ওই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ও বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি আতিকুল ইসলাম। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক সংবর্ধনা। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত অবধি বিভিন্ন সময়ে আসেন সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, রাজনীতিক, বড়ো পর্দা- ছোটো পর্দার তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও শিল্পী-কলাকুশলী। আসেন ক্রীড়াঙ্গনের তারকারাও।

সূত্র: ১১ জানুয়ারি ২০১৯, কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশ প্রতিদিনের ১০ বছরে পদার্পণ

পাঁচ বরেণ্য ব্যক্তিকে সম্মাননা

দশম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে পাঁচ বরেণ্য ব্যক্তিকে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিন। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান (মরণোত্তর), বরেণ্য কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, খ্যাতনামা অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী ও ফরিদা আখতার ববিতা এবং খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হানিফ সংকেতকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

২৩ মার্চ রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) নবরাত্রি হলে এ উপলক্ষ্যে ছিল বর্ণাঢ্য আয়োজন। সকাল থেকে সেখানে ছিল ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসা লোকের ভিড়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে বরেণ্যজনদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান।

সূত্র: ২৪ মার্চ ২০১৯, কালের কণ্ঠ

স্মরণসভায় বক্তারা

সাংবাদিকদের দুর্দিনের বন্ধু ছিলেন শাহ আলমগীর

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) সাবেক মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তিনি নিজের স্বার্থ না দেখে সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। সাংবাদিকদের দুর্দিনের বন্ধু ছিলেন তিনি। দলমত নির্বিশেষে সব সাংবাদিকের কাছে তাঁর দেখানো পথ অনুসরণীয়।

২২ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রয়াত শাহ আলমগীর স্মরণে সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্র (বিজেসি) আয়োজিত এক সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে শাহ আলমগীর স্মরণে প্রার্থনা সংগীত ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রদর্শন করা হয় তার কর্মময় জীবনের একটি ভিডিওচিত্র। পরে শাহ আলমগীরের কর্মময় জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সহকর্মী ও বন্ধুরা।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম বলেন, 'শাহ আলমগীরের সঙ্গে আমার ৪৭ বছরের সম্পর্ক। আলমগীর এই ৪৭ বছরে মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছে, তা অকৃত্রিম। এ ভালোবাসা মেকি নয়। মানুষ তাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে। এ রকম সফল জীবন আর হতে পারে না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মফিজুর রহমান বলেন, 'শাহ আলমগীর ছিলেন সদালাপী। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে শান্তি আসত।'

দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামান বলেন, 'শাহ আলমগীর গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলের উদ্যোগ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছেন। এটা একটা বিশাল কাজ। ভালো মানুষ না হলে এমন কাজ করা যায় না। তিনি সবসময় কমিউনিটির স্বার্থের কথা ভাবতেন।'

সমকালের উপসম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত বলেন, 'শাহ আলমগীর কঠিন কথা সহজে বলতে পারতেন। তিনি ছিলেন বটবৃক্ষের মতো, যার ছায়াতলে এলে মন ভালো হয়ে যেত।'

প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান বলেন, শাহ আলমগীরের মতো বন্ধু তৈরির ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। তিনি একাধারে সাংবাদিক নেতা ও কর্মী ছিলেন। তাঁর দুঃখ-কষ্ট সহজে প্রকাশ পেত না; কিন্তু আনন্দের বিষয়গুলো তিনি সবার সঙ্গে ভাগ করতেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, শাহ আলমগীর কখনো ক্ষোভ লালন করতেন না। তিনি কখনো কারও সঙ্গে কড়া ভাষায় কথা বলেননি। আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করেছি, সাংবাদিক ইউনিয়ন করেছি। আমি দেখেছি, অন্যরা তাঁর বিরুদ্ধে বললেও তিনি কখনোই কারও বিরুদ্ধে, কারও পেছনে কথা বলতেন না।

একাত্তর টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল বাবু বলেন, শাহ আলমগীর ছিলেন একই সঙ্গে সৎ, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী ও দক্ষ। তাঁর মধ্যে মানুষের সব গুণই উপস্থিত ছিল। তিনি একজন অনুকরণীয় মানুষ।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, শাহ আলমগীর কখনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। হাসিমুখ ছাড়া তাঁকে কল্পনা করা যায় না।

প্রধান তথ্য কমিশনার মর্তুজা আহমেদ বলেন, ১৯৮৫ সালে পিআইবি গঠিত হয়; কিন্তু শাহ আলমগীরের সময়টা হচ্ছে পিআইবির স্বর্ণযুগ। তার আমলে পিআইবিতে যত কাজ হয়েছে এবং পিআইবিকে যেভাবে প্রযুক্তিসহ উন্নত করা হয়েছে, তা আগে কখনো হয়নি। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, শাহ আলমগীরের গণমাধ্যমের সব শাখায় স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ ছিল। তিনি অনেক সাংবাদিক তৈরি করেছেন। তিনি সফল সাংবাদিক ও প্রশাসক ছিলেন।

বিজেসির ট্রাস্টি রাশেদ আহমেদের সঞ্চালনায় স্মরণসভায় আরও বক্তব্য দেন শাহ

আলমগীরের সহধর্মিণী ফৌজিয়া বেগম মায়া, মাছরাঙা টেলিভিশনের হেড অব নিউজ রেজওয়ানুল হক রাজা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে শাহ আলমগীরের পরিবারের হাতে বিজেসির পক্ষ থেকে একটি জলছবি স্মৃতি হিসেবে তুলে দেন জিটিভির প্রধান সম্পাদক ও বিজেসির অন্যতম ট্রাস্টি সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা।

সূত্র: ২৩ মার্চ ২০১৯, সমকাল

সাংবাদিক শাহ আলমগীর ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠার বাতিঘর

প্রয়াত সাংবাদিক মো. শাহ আলমগীর সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার বাতিঘর। নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে ওঠে আসা এ মানুষটি সজ্জন, প্রগতিশীল ও মানবিক বোধে উজ্জ্বল ছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে। ৪ মার্চ রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রয়াত সাংবাদিক শাহ আলমগীর স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) যৌথভাবে এ স্মরণসভার আয়োজন করে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের তৃতীয় তলায় একটি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু জাফর সূর্য।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, শাহ আলমগীর সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি ছিলেন নীতিনিষ্ঠ। একজন ভালো সাংবাদিকের এবং ভালো মানুষের উদাহরণ তিনি।

এ সময় পিআইবির মহাপরিচালক মীর মো. নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ৫ মার্চ ২০১৯, কালের কণ্ঠ

আবেদ খান পিআইবির চেয়ারম্যান

বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খানকে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছে সরকার।

১১ মার্চ তথ্য মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ১৫ সদস্যের নাম প্রকাশ করেছে। পিআইবি আইন, ২০১৮-এর ৭ ধারা অনুযায়ী এ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তিনি প্রকাশিতব্য দৈনিক জাগরণের সম্পাদক। মুক্তিযোদ্ধা আবেদ খান অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় সাংবাদিকতায় যুক্ত রয়েছেন। তিনি দৈনিক ভোরের কাগজ, যুগান্তর এবং সমকালেও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

নবগঠিত পিআইবির পরিচালনা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মনোনীত যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। এছাড়া তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান, ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বাংলাদেশ পোস্টের প্রধান সম্পাদক শরীফ সাহাবুদ্দিন, একাত্তর টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক বাবু, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ দীপ আজাদ, একই সংগঠনের সদস্য শেখ মামুনূর রশীদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ সংবাদদাতা অনুপ খাস্তগীর এ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। পিআইবির মহাপরিচালক এই বোর্ডের সদস্য সচিব।

সূত্র: ১২ মার্চ ২০১৯, সমকাল

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ও প্রথম চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা 'সিনেমা'র সম্পাদক এবং বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'প্রেসিডেন্ট'-এর পরিচালক ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী ২৬ অক্টোবর। ফজলুল হকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'ফজলুল হক স্মৃতি কমিটি' ২০০৪ সাল থেকে এদিনে 'ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার' দিয়ে আসছে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন। এ বছর এ পুরস্কার পেয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালনায় মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় শফিউজ্জামান খান লোদী। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি ১২ জানুয়ারি ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য দেন সৈয়দ হাসান ইমাম। পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে উত্তরীয়, ক্রেস্ট ও পুরস্কারের অর্থমূল্য তুলে দেন সংসদ সদস্য আকবর হোসেন খান পাঠান, আনোয়ারা ও সুজাতা। পুরস্কার প্রদানের পর মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা ফজলুল হকের জীবন ও কর্ম নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

সূত্র: ১৩ জানুয়ারি ২০১৯, ইত্তেফাক

দৈনিক সময়ের আলোর অনলাইন উদ্বোধন ও প্রতিনিধি সম্মেলন

দৈনিক সময়ের আলোর অনলাইন উদ্বোধন ও প্রতিনিধি সম্মেলন ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইন সংস্করণের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ এম এম এনামুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ও ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ও ডিবিসি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন একুশে টিভির প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রমজানুল হক নিহাদ ও দৈনিক সময়ের আলোর প্রকাশক গাজী আহমেদউল্লাহ।

সূত্র: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, সমকাল

কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

আজাদ সভাপতি তুহিন সম্পাদক

কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে আবুল কালাম আজাদ (ইত্তেফাক) ও সাধারণ সম্পাদক পদে তুহিন হাওলাদার (বাংলাদেশ প্রতিদিন) নির্বাচিত হয়েছেন। ২৯ জানুয়ারি পুরান ঢাকার জেলা জজ আদালত ভবনের নিচতলায় কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কক্ষে দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। নির্বাচনে এবার ৫৪ জন ভোট দিয়েছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহাজাহান খান জানান, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক পদে শুধু ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া অন্য পদগুলোয় প্রার্থীদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে সিনিয়র সহসাধারণ সম্পাদক পদে লুৎফর রহমান জয়ী হন।

বিনা ভোটে ১০ জন নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন– সিনিয়র সহসভাপতি পদে জাকারিয়া হায়দার ও সহসভাপতি পদে রুবেল হাওলাদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে শুভ্র সিনহা রায়, কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার) পদে ফরিদা ইয়াসমিন

জেসি, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক পদে মিজানুর রহমান, কার্যকরী সদস্য পদে এমএ জলিল উজ্জ্বল, আবদুল্লাহ আল মনসুর, মাহবুবুল হাসান রানা, মোহাম্মদ শাহ আলম সোহাগ ও মুহাম্মদ ওয়াহিদুন নবী বিপ্লব।

নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যরা পরে উপদেষ্টা কমিটি নির্বাচন করেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন– শাহজাহান খান, সৈয়দ আহমেদ গাজী, মুনজুর আলম, এমদাদুল হক লাল ও আশরাফ-উল-আলম।

সূত্র: ৩০ জানুয়ারি ২০১৯, সমকাল

ল' রিপোর্টার্স ফোরাম

হিরণ সভাপতি রাজু সাধারণ সম্পাদক

ল' রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ) ২০১৯-২০২০ সালের নির্বাচনে সভাপতি পদে সমকালের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ওয়াকিল আহমেদ হিরণ ও সাধারণ সম্পাদক পদে মানবজমিনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক নাজমুল আহসান রাজু নির্বাচিত হয়েছেন। ৮ মার্চ সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে এলআরএফের কার্যনির্বাহী কমিটির ১৩টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবার সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন হলেও অন্য পদগুলোয় একক প্রার্থী থাকায় তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

কমিটির অন্যরা হলেন– সহ-সভাপতি হিরা তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদক মতলু মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুল হক মৃধা, সাংগঠনিক সম্পাদক মনজুর হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক তানভীর আহমেদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মেহেদী হাসান ডালিম এবং প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ সম্পাদক মাসউদুর রহমান। এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে রয়েছেন এসএম নুর মোহাম্মদ, জাহিদ হাসান, খাদেমুল ইসলাম ও বাহাউদ্দিন আল ইমরান। এর আগে সংগঠনের সভাপতি সাঈদ আহমেদ খানের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হাসান জাবেদ।

সূত্র: ৯ মার্চ ২০১৯, সমকাল

বিশ্বজুড়ে ৩২ নারী সাংবাদিক কারাবন্দি

বিশ্বজুড়ে আড়াই শতাধিক সাংবাদিক তাঁদের পেশাগত কাজের জন্য কারবন্দি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩২ জন নারী। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আগের দিন ৭ মার্চ কমিটি টু প্রটেস্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) তাদের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে সিপিজে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৩ নারী সাংবাদিক কারাবন্দি ছিলেন। কারাভোগ করে ওই মাসে মুক্তি পান তুরস্কের জেহরা দোলন। রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় কারাদণ্ড হয়েছিল তাঁর। এছাড়া সৌদি আরবে আটক রয়েছেন চার নারী সাংবাদিক। দেশটিতে নারীদের ওপর গাড়ি চালানোর নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করে তাঁদের কারাবরণ করতে হয়।

সিপিজে আরও জানায়, কারাবন্দি ৩২ নারী সাংবাদিকের মধ্যে শুধু তুরস্কেই আছেন ১৪ জন। চীনে করাভোগ করছেন সাতজন। সৌদি আরবে চারজন। এছাড়া ভিয়েতনাম, মিসর, ইসরাইল ও দখলকৃত ফিলিস্তিনি এলাকায় দুজন করে এবং সিরিয়ায় এক নারী সাংবাদিক কারাবন্দি রয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগকেই কারাগারে যেতে হয়েছে রাজনৈতিক বিষয়, মানবাধিকার, সংস্কৃতি, দুর্নীতি এবং যুদ্ধ ও সংঘাত নিয়ে প্রতিবেদন করায়। ওই ৩২ জনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বন্দিদশায় রয়েছেন কোনো কারাদণ্ড ছাড়াই। এছাড়া রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তুরস্কের ভাইস নাজলি ইলিয়কে ও হাতিস দুমান এবং চীনের গুলমির ইমন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

সূত্র: ৯ মার্চ ২০১৯, প্রথম আলো

শোক সংবাদ

পিআইবি মহাপরিচালক শাহ আলমগীর আর নেই

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক ও খ্যাতনামা সাংবাদিক মো. শাহ আলমগীর (৬২) আর নেই। ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

শাহ আলমগীর লিউকোমিয়া ও ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সিএমএইচে ভর্তি করা হয়। সেখানে আইসিইউতে থাকা অবস্থায় ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। তাকে রাজধানীর উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শাহ আলমগীরের মরদেহ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে আনা হলে তার সহকর্মী অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। জানাজার আগে তার কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি আবু জাফর সূর্য এবং শাহ আলমগীরের ছেলে আশিকুল আলম দ্বীপ।

এ সময় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ শফিকুর রহমান এমপি, অসীম কুমার উকিল এমপি, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মনজুরুল আহসান বুলবুল, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জিটিভির প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম, গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীর, আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, সিপিবির কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সাবেক ও বর্তমান সাংবাদিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিএফইউজের মহাসচিব শাবান মাহমুদ, বিএফইউজের সাবেক মহাসচিব ওমর ফারুক, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কবির আহমেদ খান, কুদ্দুস আফ্রাদ, নাসিমুন আরা হক প্রমুখ।

জানাজা শেষে আওয়ামী লীগ, সিপিবি, জাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও সংগঠন শাহ আলমগীরের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এর আগে তার পৈতৃক বাড়ি পূর্ব গোড়ান ও তার কর্মস্থল পিআইবি মিলনায়তন এবং পরে উত্তরার ৫ নম্বর সেক্টরে নিজ বাসভবনে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আলমগীর শিশু-কিশোর সাপ্তাহিক কিশোর বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন। ২০১৩ সালের ৭ জুলাই তিনি পিআইবির মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এর আগে তিনি প্রথম আলো, সংবাদ, জনতা, বাংলার বাণী, আজাদ, যমুনা টেলিভিশন, চ্যানেল আই, একুশে টেলিভিশন, মাছরাঙা টেলিভিশন ও এশিয়ান টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

শাহ আলমগীর শিশুকল্যাণ পরিষদ এবং শিশু ও কিশোরদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'চাঁদের হাট'-এর সভাপতি এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ২০০৬ সালে 'কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার', ২০০৫ সালে 'চন্দ্রাবতী স্বর্ণপদক', ২০০৪ সালে 'রোটারি ঢাকা সাউথ ভোকেশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' ও ২০০৪ সালে 'কুমিল্লা যুব সমিতি অ্যাওয়ার্ড' পান। শাহ আলমগীরের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায়।

শাহ আলমগীরের মৃত্যুতে তিন দিনের জন্য একটি শোকবই খুলে ডিইউজে। ৩ মার্চ পর্যন্ত এ শোকবই খোলা থাকবে। এছাড়া ৪ মার্চ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তার মৃত্যুতে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নবিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এমপি, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ, সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনৈতিক দল এনডিপির নেতাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

সূত্র: ১ মার্চ ২০১৯, সমকাল

আল মাহমুদ

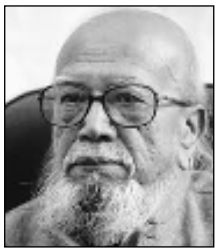

চলে গেলেন বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ। ৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মীর আবদুস শুক্কুর আল মাহমুদ। তাঁর বাবা মীর আবদুর রব ও মা রওশন আরা মীর। তাঁর দাদা আবদুল ওহাব মোল্লা ব্রিটিশ ভারত শাসনামলে হবিগঞ্জ জেলায় জমিদার ছিলেন।

আল মাহমুদ কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাইস্কুলে এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে পড়ালেখা করেন। স্কুলজীবনেই শুরু হয় তাঁর লেখালেখি। আধুনিক বাংলা কবিতার শহরমুখী প্রবণতার মধ্যেই ভাটি-বাংলার জনজীবন এবং নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে তিনি কবিতায় অবলম্বন করেন। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তাঁর অনন্য কীর্তি। তাঁর জাদুস্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে অনন্যা পঙ্‌ক্তিমালা। যে মৃত্যু তাঁকে নিয়ে গেল, সেই মৃত্যু নিয়ে সোনালি কাবিনে লিখে গেছেন অসামান্য কবিতার চরণ: প্রেম কবে নিয়েছিল ধর্ম কিংবা সংঘের শরণ/মরণের পরে শুধু ফিরে আসে কবরের ঘাস/যতক্ষণ ধরো এই তাম্রবর্ণ অঙ্গের গড়ন/তারপর কিছু নেই, তারপর হাসে ইতিহাস।

আল মাহমুদ ঢাকায় আসেন ১৯৫৪ সালে। সেসময় সমকালীন বাংলা সাপ্তাহিকগুলোয় লিখতে শুরু করেন তিনি। পাশাপাশি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকার প্রুফরিডার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে সাপ্তাহিক কাফেলার সম্পাদক হন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে আল মাহমুদ দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক হিসেবে চাকরি দেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি বিভাগটির পরিচালক হন। পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে সেখান থেকে তিনি অবসরে যান।

আল মাহমুদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালি কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, অদৃশ্যবাদীদের রান্নাবান্না, দিনযাপন, দ্বিতীয় ভাঙন, নদীর ভেতরের নদী।

সূত্র: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো

এম আনোয়ারুল হক

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এম আনোয়ারুল হক (৬২) আর নেই। ২২ মার্চ রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। কিছু দিন ধরে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণসহ নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।

সাংবাদিকতা জীবনে এম আনোয়ারুল হক ডেইলি স্টারের ডিপ্লোম্যাটিক করসপনডেন্ট, সিটি এডিটর ও চিফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া মর্নিং সান, দ্য পিপলসহ বিভিন্ন ইংরেজি দৈনিকে কাজ করেন তিনি। বাংলাদেশের দিল্লি হাইকমিশনে প্রেস মিনিস্টারের দায়িত্বও পালন করেন। এছাড়া ডিআরইউর দুই মেয়াদে সভাপতি ছিলেন।

ধানমন্ডিতে মরহুমের প্রথম এবং পরে ডিআরইউ চত্বরে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ডিআরইউ চত্বরে ডিআরইউ, ক্র্যাব, ডিক্যাবসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তার মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

সূত্র: ২৩ মার্চ ২০১৯, সমকাল

আমানুল্লাহ কবীর

প্রবীণ সাংবাদিক আমানুল্লাহ কবীর (৭২) আর নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৬ জানুয়ারি পৌনে ১টায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। সাড়ে চার দশকের সাংবাদিকতা জীবনে আমানুল্লাহ কবীর দৈনিক আমার দেশ ও দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফের (বর্তমানে বিলুপ্ত) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। তিনি ডেইলি স্টারের বার্তা সম্পাদক এবং ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন অস্ত্র হাতে। এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনেও পেশাজীবীদের মধ্যে নেতৃত্বের কাতারে ছিলেন তিনি। সর্বশেষ তিনি অনলাইন সংবাদপত্র বিডিনিউজের জ্যেষ্ঠ সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ডায়াবেটিস ও লিভারে সমস্যার কারণে দুই সপ্তাহ আগে শ্যামলীর ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল আমানুল্লাহ কবীরকে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে তাকে প্রথমে ধানমন্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালে এবং পরে বিএসএমএমইউতে নেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের ২৪ জানুয়ারি জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন আমানুল্লাহ কবীর।

সূত্র: ১৬ জানুয়ারি ২০১৯, সমকাল

মুহম্মদ খসরু

চলে গেলেন বাংলাদেশের সুস্থ চলচ্চিত্র আন্দোলনের পুরোধা মুহম্মদ খসরু। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে ২১ জানুয়ারি কেরানীগঞ্জের রোহিতপুরের নিজ বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর গভীর রাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে এতদিন তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন। মৃত্যুর আগে শ্বাসকষ্টসহ অন্যান্য শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন মুহম্মদ খসরু।

উল্লেখ্য, বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম পত্রিকা ধ্রুপদী ও চলচ্চিত্র-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতাও তিনি। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা রাজেন তরফদারের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পালঙ্কে খসরু সহকারী পরিচালক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ঋত্বিক ঘটকের অনবদ্য ও বিশ্লেষণধর্মী একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন ৭০ দশকের প্রথমার্ধে, যা ধ্রুপদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপরই সুধিমহলে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। পরে

এ সাক্ষাৎকারটি উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় পুনর্মুদ্রণ করা হয়।

সূত্র: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ইত্তেফাক

সফিউল আলম

নিজের জন্মস্থান কুড়িগ্রামের চিলমারীর বন্দরে শান্তিনিকেতনের আদলে একটি ভাওয়াইয়া ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখতেন শিল্পী সফিউল আলম রাজা (৪৬)। সেই স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেল, চলে গেলেন ভাওয়াইয়াশিল্পী ও সাংবাদিক সফিউল আলম।

রাজধানীর পল্লবী এলাকার নিজের প্রতিষ্ঠিত কলতান সাংস্কৃতিক একাডেমির একটি কক্ষ থেকে সফিউল আলমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফনের সিদ্ধান্ত হয়।

১৬ মার্চ একটি বেসরকারি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে তিনি পল্লবীতে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত কলতান সাংস্কৃতিক একাডেমির একটি কক্ষে যান। ১৭ মার্চ পুলিশ সেখান থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

পেশায় সাংবাদিক সফিউল আলমকে বিভিন্ন গণমাধ্যমের শ্রোতা-দর্শকরা 'ভাওয়াইয়া রাজা' নামে ডাকতেন। ভাওয়াইয়া গানের প্রসারে রাজা ২০০৮ সালে ভাওয়াইয়া নামে গানের দল প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভাওয়াইয়া স্কুল। ২০১৭ সালে কলতান সাংস্কৃতিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

শিল্পী ও সাংবাদিকতা জীবনে স্বীকৃতিস্বরূপ সফিউল আলম বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি দৈনিক যুগান্তরে ১৫ বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি প্রিয়ডটকমের প্রধান প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছেন।

সূত্র: ১৮ মার্চ ২০১৯, প্রথম আলো

ফরহাদ হোসেন

প্রবীণ আলোকচিত্রী ফরহাদ হোসেন (৭১) রাজধানীর রামপুরায় নিজ বাসভবনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ফরহাদ হোসেন ১৯৪৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

২০১১ সালের ২৬ জুন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন ফরহাদ হোসেন। এরপর সাত বছর ধরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

কর্মজীবনে দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বার্তা, দৈনিক জনতা, দৈনিক রূপালী, নিউজ ডেসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোকচিত্রী হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে দৈনিক নিউনেশনে কাজ করার সময় অফিসেই অসুস্থ হন তিনি।

সূত্র: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, সমকাল

বশির আহমদ

প্রবীণ সাংবাদিক এম বশির আহমদ (৭৫) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ২৪ জানুয়ারি পল্লবীর সাংবাদিক আবাসিক এলাকার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় তাঁর। তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন।

কর্মজীবনের প্রায় চার দশক দৈনিক সংবাদে ছিলেন বশির আহমদ। পল্লবীর সাংবাদিক আবাসিক এলাকা জামে মসজিদে মরহুমের জানাজা হয়। এরপর কালশী কবরস্থানে দাফন করা হয় তাঁর লাশ।

সূত্র: ২৫ জানুয়ারি ২০১৯, কালের কণ্ঠ

নাসির উদ্দিন

কালের কণ্ঠের সাবেক সাংবাদিক নাসির উদ্দিন (৬০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৯টায় রাজধানীর হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। দীর্ঘদিন তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন।

তিনি সাতক্ষীরার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে ১৯৫৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি দৈনিক নিউ নেশনের জন্মলগ্নে শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন তিনি। পরবর্তী সময়ে দি ইনডিপেনডেন্টে কাজ করেন। সর্বশেষ কালের কণ্ঠে ২০১০ সালে যোগদান করেন এবং ২০১৫ সালে তিনি অবসর নেন।

সূত্র: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কালের কণ্ঠ

রাশেদ সোহরাওয়ার্দী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ছেলে রাশেদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ৭ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে নিজ বাসায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রাশেদ সোহরাওয়ার্দী ব্রিটেনে রবার্ট অ্যাশবি নামে পরিচিত। খ্যাতিমান ব্রিটিশ লেখক ও অভিনেতা হিসেবে তিনি সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এ অভিনেতা 'লিজেন্ড' (২০১৫), 'ডক্টর হু' (১৯৬৩) ও 'জিন্নাহ' (১৯৯৮) চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিতি পান। তাঁর মা ভিরা আলেকচান্দ্রাভনা ছিলেন খ্যাতিমান রুশ অভিনেত্রী। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সূত্র: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কালের কণ্ঠ

আনোয়ারুল হক

পাবনা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রবীণ সাংবাদিক, ভাষাসংগ্রামী আনোয়ারুল হক (৮২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ২৯ জানুয়ারি পাবনা শহরের শালগাড়িয়া মহল্লার নিজ বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। শহরের চাঁপাবিবি মসজিদে জানাজা শেষে আরিফপুর সদর গোরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

১৯৬১ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠিত পাবনা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন আনোয়ারুল হক।

সূত্র: ৩১ জানুয়ারি ২০১৯, সমকাল

আবু বকর চৌধুরী

দৈনিক মানবকণ্ঠের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আবু বকর চৌধুরী (৫৪) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১৫ জানুয়ারি রাজধানীর ধানমন্ডির বাসায় হার্ট অ্যাটাকের পর পাশের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মানবকণ্ঠের আগে সাপ্তাহিক প্রত্যায়ন, খবরের কাগজ, দৈনিক আজকের কাগজ, আমাদের সময়, সমকাল, সকালের খবরসহ দেশের প্রথমসারির বিভিন্ন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন আবু বকর চৌধুরী।

১৯৬৪ সালের ২১ জুন ঢাকার গ্রিন রোডে জন্ম আবু বকর চৌধুরীর। বাবা আবদুল হালিম চৌধুরী ও মা রাজিয়া খাতুনের ৯ ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্টে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

সূত্র: ১৬ জানুয়ারি ২০১৯, কালের কণ্ঠ

কামরুজ্জামান চৌধুরী

সুনামগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক, জেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুনামগঞ্জ প্রতিদিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কামরুজ্জামান চৌধুরী সাফি (৭৫) ১০ জানুয়ারি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ঢাকার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথমে তাঁর মরদেহ নেওয়া হয় প্রেস ক্লাবে। সেখানে সর্বস্তরের সাংবাদিকের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে বাদ আসর পৌর শহরের আরপিনগর ঈদগাহ ময়দানে জানাজা শেষে আরপিননগর কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

সূত্র: ১১ জানুয়ারি ২০১৯, সমকাল

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা সাংবাদদাতাদের জন্য পিআইবিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, *এমপি*

বাসস'র জেলা সংবাদদাতাদের জন্য দিনব্যাপী কর্মশালা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি আয়োজিত বাসস'র জেলা সংবাদদাতাদের জন্য দিনব্যাপী কর্মশালা ২৭ মার্চ পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মীর মো. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। কর্মশালায় বাসস'র ৬১ জন জেলা সংবাদদাতা অংশগ্রহণ করেন।

বাঘায় অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ৯ জানুয়ারি বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহিন রেজা। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি'র পরিচালক মো. ইলিয়াস ভূইয়া। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি আয়োজিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৪-৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ এর সংসদ সদস্য আ র ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

প্রধান অতিথি বলেন, সাংবাদিক হলেন সত্য ও নির্ভীকতার প্রতীক, তাই সাংবাদিকদের লেখনীতে আপামর জনসাধারণের যেন ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকা জরুরি। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি খ আ ম রশিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক দীপক চৌধুরী বাপ্পী। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

খুলনায় ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক প্রশিক্ষণ

এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম-এটুআই এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি'র যৌথ উদ্যোগে খুলনা সার্কিট হাউসে ২১ ও ২২ মার্চ খুলনা বিভাগের স্থানীয় সাংবাদিকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক আলাদা দুটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ মার্চ স্থানীয় নারী সাংবাদিকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকদের মধ্যে সনদ প্রদান করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মীর মো. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) সাইফুল হক। সভাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মুন্সী মাহবুব আলম সোহাগ।

সচিবালয় বিটের সাংবাদিকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক প্রশিক্ষণ

এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম-এটুআই এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর যৌথ উদ্যোগে পিআইবি'তে ২৪ ও ২৫ মার্চ সচিবালয় বিটের সাংবাদিকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক আলাদা ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এটু আই ও পিআইবি যৌথ উদ্যোগে সচিবালয় বিটের সাংবাদিকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

পিআইবিতে আয়োজিত শিশু সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণে বক্তৃতা দিচ্ছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম

হয়েছে। প্রশিক্ষণ দুটিতে ১০০ সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। সভাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মীর মো. নজরুল ইসলাম।

বাগেরহাটে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

বাগেরহাটের সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ২১ মার্চ বাগেরহাট প্রেস ক্লাবে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সাখিলুর রহমান। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র পরিচালক মো. ইলিয়াস ভূইয়া। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৫ সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ফেনীর সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি আয়োজিত ফেনী রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ১৮ জানুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে)' সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে ফেনী রিপোর্টার্স ইউনিটির ২৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

শিশু সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত শিশু সাংবাদিকদের জন্য দুই দিনব্যাপী শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ২৬ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জিটিভির প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং ৭১ টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ফারজানা রূপা। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র পরিচালক মো. ইলিয়াস ভূইয়া।

চাঁদপুরের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর ও দক্ষিণ উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ২৪ ফেব্রুয়ারি সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র পরিচালক মো. ইলিয়াস ভূইয়া। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমের মোট ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

দুর্গাপুর ও কলমাকান্দার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র পরিচালক মো. ইলিয়াস ভূইয়া। প্রশিক্ষণে দুইটি উপজেলা থেকে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সাংবাদিকদের জন্য দুটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী দুটি প্রশিক্ষণ (বুনিয়াদি ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ) ১৩ মার্চ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাজশাহীর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আনওয়ার হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক এ জেড এম নুরুল হক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ সুপার টি এম মোজাহিদুল ইসলাম আজাদ। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র পরিচালক মো. ইলিয়াস ভূইয়া।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিন দিনব্যাপী বুনিয়াদি ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান